দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ-স্মরণই এখন শ্রেষ্ঠ পথ— পৃঃ ২৩

নজরুল-দরদি শ্যামাপ্রসাদ — পৃঃ ৩৫

৭৭ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ৩০ জুন, ২০২৫।। ১৫ আষাঢ়, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

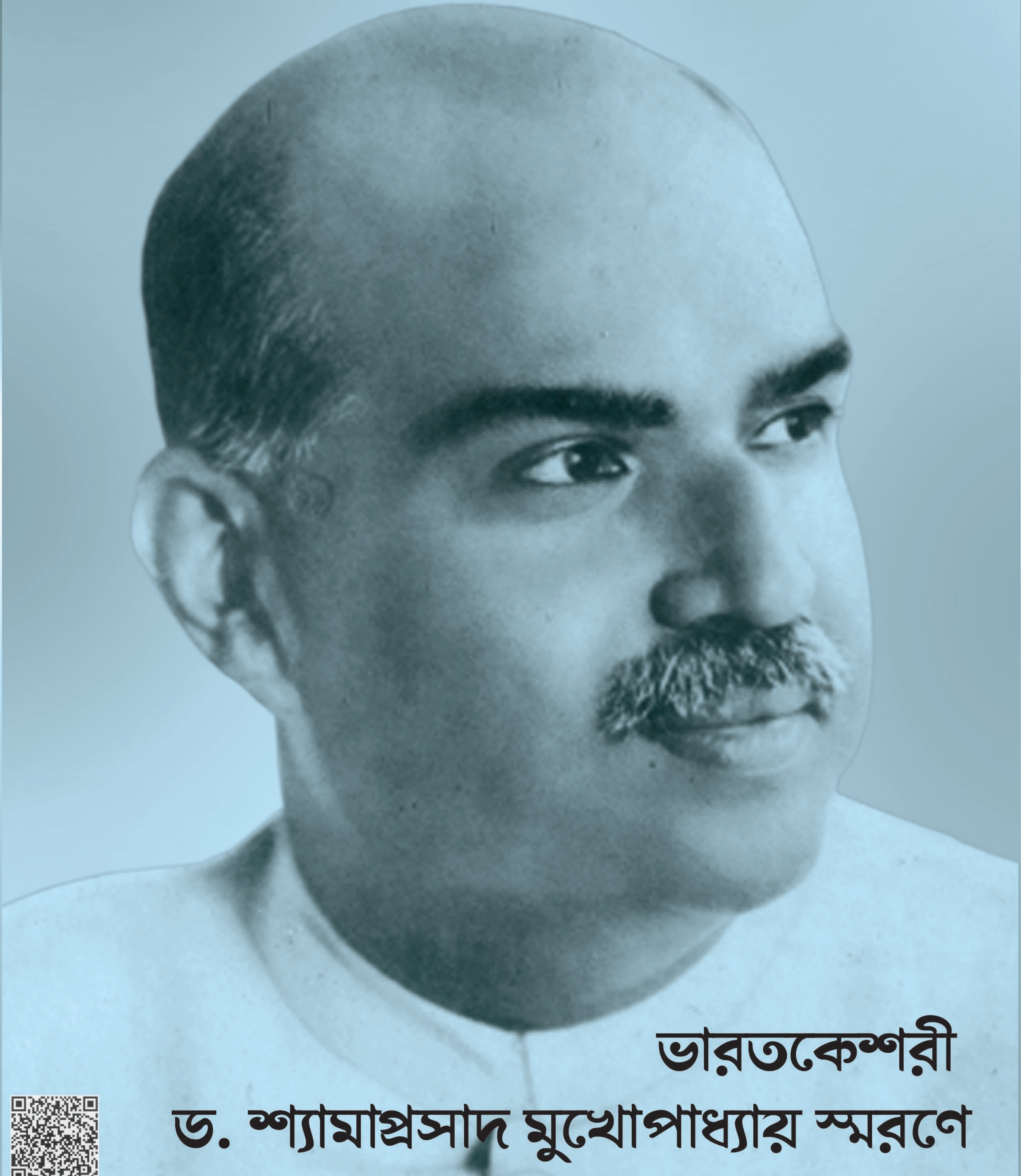

ভারতকেশরী
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মরণে

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

৭৭ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ১৫ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৩০ জুন - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

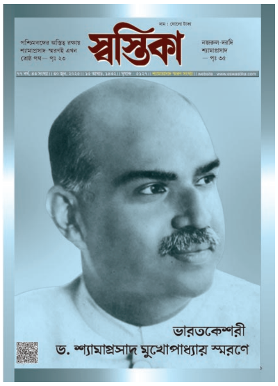

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি ডায়মন্ড হারবারের বাইরে জিততে পারবেন ? বালি থেকে তেল ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

খানিক নীরবতা পালন করুন দিদি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

সঙ্ঘ শাখা মানে সত্যের সাধনা ◻ মধুভাই কুলকর্ণী ◻ ৮

গত ১১ বছরে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে দেশের ২৭ কোটি মানুষ

◻ কৌটিল্য ◻ ১০

ভারতের আকাশে আপন আলোয় উদ্ভাসিত এক মহা জ্যোতিষ্ক ড. শ্যামাপ্রসাদ ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

ঘাসফুল আঁকা ঝুলিতে হিন্দু ভোটে টান, তাই দিঘায় জগন্নাথ মন্দির

◻ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য ◻ ১৪

পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ

◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ১৬

পুনরাবৃত্তির পথে ইতিহাস : ২০ জুনের শিক্ষা কি আজও প্রাসঙ্গিক? ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ১৮

একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

◻ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ১৯

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ-স্মরণই এখন শ্রেষ্ঠ পথ

◻ মোহিত রায় ◻ ২৩

রামময় বঙ্গভূমি : প্রায় সব জেলাতেই রামের নামে গ্রাম

◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

পত্রসাহিত্যে স্বামীজীর মহাসমাধি ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩৩

নজরুল-দর্শন শ্যামাপ্রসাদ ◻ অভিজিৎ দাশগুপ্ত ◻ ৩৫

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ড. শ্যামাপ্রসাদ

◻ অম্লান কুসুম ঘোষ ◻ ৪১

ভারতীয় সংসদে জোট রাজনীতির প্রথম সফল প্রবক্তা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ◻ ড. বিনয়ভূষণ দাশ ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০

প্রকাশিত হবে
৭ জুলাই
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৭ জুলাই
২০২৫

জেহাদিদের বাড়বাড়ন্ত

পশ্চিমবঙ্গে বেড়েই চলেছে জেহাদি কার্যকলাপ। মোথাবাড়ি ও মুর্শিদাবাদের পর সম্প্রতি মহেশতলায় প্রকাশ্যে এসেছে জেহাদিদের ভয়াবহ তাণ্ডব। রাজ্য সরকার ও শাসক দলের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদতে রাজ্যজুড়ে ঘটে চলেছে জেহাদিদের বাড়বাড়ন্ত।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের পট পরিবর্তন

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালিদের নিকট একটি আবেগজড়িত নাম। তিনি না থাকিলে বাঙ্গালিদের অস্তিত্বরক্ষার ভূমি পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিও থাকিত না। তাঁহার রাজনৈতিক জীবন হিন্দুদের জন্যই উৎসর্গীকৃত ছিল। তাঁহার ন্যায় হিন্দুপ্রেমী রাজনৈতিক নেতা সেই সময়কালে কেহই ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। বাঙ্গালার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুপুত্র তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ভাইস চ্যান্সেলর পিতাকে শিক্ষাসংক্রান্ত নানান বিষয়ে সহায়তা করিতেন। পিতার ন্যায় তিনিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা-পূর্ব বঙ্গপ্রদেশের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার রাজনীতিতে আগমন। মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের গুন্ডামি যে অদূর ভবিষ্যতে এই দেশের, বিশেষ করিয়া হিন্দুদিগের দুর্গতির কারণ হইবে তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহা রোধ করিতেই তিনি ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির বঙ্গীয় সরকারে যোগ দিয়াছিলেন। সেই মন্ত্রীসভায় তিনি আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব সফলভাবে পালন করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে বীর সাভারকরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দু মহাসভার সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং ক্রমে সর্বভারতীয় সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। বঙ্গীয় মন্ত্রীসভায় থাকার সময়ে তিনি বঙ্গের হিন্দুদের বিভিন্ন অধিকারের বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন পাইলেও হিন্দুদের ভালো-মন্দ লইয়া ভাবিত ছিল না। ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগ তাহাদের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পঞ্জাব ও বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা বলে। কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ইহাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করে। কিন্তু দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদ ইহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়া আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। তিনি ভারত ভাগের তীব্র বিরোধী হইলেও বিভাজন যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল তখন তিনি বঙ্গ বিভাজনের দাবিতে সোচ্চার হইয়াছিলেন। সেই সময় বেশ কয়েকজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁহাকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন। তাহারই পরিণতিতে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গপ্রদেশের হিন্দুবহুল পশ্চিমাংশ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির সৃষ্টি হয়। বাঙ্গালি হিন্দুদের ভুলিলে চলিবে না যে পশ্চিমবঙ্গের জনক হইলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিবস হইল ২০ জুন। স্বাধীন ভারতে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী রূপে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার শিল্পনীতি প্রণয়ন, শিল্পোন্নয়ন নিগম, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা, সিন্ধ্রি সার কারখানা স্থাপনের সহিত খড়্গপুরে দেশের প্রথম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্থাপনের কথা দেশবাসী শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু দরদি রাজনীতিবিদ। হিন্দুদিগের স্বার্থরক্ষাই তাঁহার ব্রত ছিল। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের প্রবল অত্যাচারের প্রতিবাদে লোকসভায় তিনি মুখর হন। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করেন। নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির সহিত এই দেশের মূল সমাজ হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা করিবার মানসে তিনি ১৯৫১ সালে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। জন্মলগ্ন হইতেই এই নূতন দলটিকে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। নূতন দলের সদস্য হিসাবে লোকসভায় তিনি দেশের স্বার্থরক্ষায় সোচ্চার হইয়াছেন। ভারতের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং সংবিধানে কাশ্মীরের জন্য ৩৭০ ধারা ও ইনার পারমিট ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে তিনি কাশ্মীর অভিযান করেন। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য, সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু যে স্বাভাবিক নহে তাহা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। শ্যামাপ্রসাদ-জননী যোগমায়াদেবী তাঁহার পুত্রের এই রহস্যমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য জওহরলাল নেহরু এবং শেখ আবদুল্লার নিকট তদন্তের দাবি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন রাজনৈতিক হিন্দু। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট-সহ স্বার্থান্বেষী দলগুলি চিরকাল শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁহার মতাদর্শের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার মতাদর্শ এবং তাঁহার সৃষ্ট হিন্দু স্বার্থরক্ষাকারী দলটির অগ্রগতি কেহ রুদ্ধ করিতে পারে নাই। আজ ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবাসীর মানসলোকে স্থান করিয়া লইয়াছে। কংগ্রেস-সহ সেকু-মাকুর দল দীর্ঘদিন শ্যামাপ্রসাদকে বাঙ্গালি মানস হইতে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদধন্য এই হিন্দু রাজনেতা এবং তাঁহার মতাদর্শ আজ বাঙ্গালি তথা ভারতবাসী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। ভারতবাসী আজ ভারতের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহারই সৃষ্ট দল এবং তাঁহার উত্তরসূরীদিগের হস্তে প্রদান করিয়াছে। 'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান'-ভিত্তিক ভারতের স্বপ্ন বুকে লইয়া যিনি আত্মবলিদান দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই স্বপ্ন আজ পূরণ হইয়াছে। যাহারা একসময় ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদকে অন্ধকারে আচ্ছাদিত রাখিয়াছিল, বিধির কী বিধান যে, আজ তাহারাই অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকেই বোধ হয় ইতিহাসের পট পরিবর্তন বলা হইয়া থাকে।

সুভাষিতম্

কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।

অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।। (হিতোপদেশ)

ফুলের সঙ্গে কীটপতঙ্গও সাধুপুরুষের মাথায় চড়ে বসে। আবার সাধুপুরুষের প্রতিষ্ঠিত পাথরও দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি ডায়মন্ড হারবারের বাইরে জিততে পারবেন?

বালি থেকে তেল

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ঘুরে ঘুরে বাজার করতে দক্ষতা লাগে। চেষ্টা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা পারেননি। নন্দীগ্রাম আসনে শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে হারিয়ে প্রমাণ করেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মুখ নন। ১৯৭৭-এ ইন্দিরা গান্ধী আর ২০১১-তে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হারের সঙ্গে হেরে যায় কংগ্রেস ও বিদেশি সিপিএম। ২০২১-এ মমতা হেরে গেলেও তৃণমূল জিতে যায়। সেই হারের লজ্জা ইন্দিরা বা বুদ্ধদেবের চেয়ে কম ছিল না। ১৯৮৯-তে যাদবপুর কেন্দ্রে সিপিএমের মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে হেরে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো 'মুখ' হয়ে ওঠেননি। তাঁর কোনো মুখ ছিল না তাই লজ্জাবোধ হয়তো কম ছিল। বাড়িতে টাঙানো ইন্দিরা আর রাজীব গান্ধীর ছবির তলায় তিনি ছিলেন একজন সাধারণ কংগ্রেস কর্মী। তাই সেই হারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু এসে যায়নি। যাদবপুরের লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে দক্ষিণ কলকাতার নিশ্চিন্ত আসনে আশ্রয় নিয়ে পরপর পাঁচবার জেতেন তিনি। ২০২১-এ নন্দীগ্রামের লড়াই তাঁর অর্ধশতাব্দীর রাজনৈতিক জীবনে সবচাইতে লজ্জার হার! তা ঢাকতে শুভেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে তিনি ভোট জালিয়াতির মামলা করেন। তাতে তাঁর দুর্বলতা প্রকট হয়। শুভেন্দুবাবুর গর্ব তিনি তৃণমূলকে হারাতে না পারলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছেন।

জনসাধারণের চোখে তৃণমূলের শতগুণ বড়ো মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় নির্বাচনের ইতিহাসে বিরোধীরা সবসময়ই শাসকের চেয়ে শক্তিশালী। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত জাতীয় ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দল ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে জেতেনি। শেষ লোকসভা ভোটে তৃণমূল ৪৫ আর সব বিরোধী দলগুলি সর্বমোট ৫৫ শতাংশ ভোট পায়, যার ৩৯ শতাংশ বিজেপির। জাতীয় ক্ষেত্রে শাসক এনডিএ ৩৭ এবং বিরোধীরা ৬৩ শতাংশ ভোট পায়।

কথায় বলে বালি থেকে তেল বের করা যায় না, যেমন হরিণ দিয়ে চাষ হয় না। রাজ্যের সংবাদমাধ্যমে 'ডগ স্কোয়াড' বা 'সারমেয় গোষ্ঠী' কথাটি ইদানীং চালু হয়েছে। আসন্ন ভোটে তারা নাকি সক্রিয় হবে। সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে এরা রাজ্যের শাসক দলের তল্পিবাহক। এরা কেবল রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের কথা বলে। তল্পি বওয়ার পুরস্কার পেয়ে থাকে। সব যুগেই এরা ছিল আর থাকবে। শাসক অনুগামী না হলে ধিক্কার শুনতে হয়। সমস্যা একটাই— ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে তারা এই রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের যা ক্ষতি করে যায়, তা মেরামত করা যায় না। রাজ্য বিজেপির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পঞ্চ পণ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র পঞ্চবাণের অনুকরণে তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চপ্রশ্ন নিয়ে ভালো রকম সরব হয়েছে স্কোয়াড। দলের সাংগঠনিক রশি তার হাতে। তবু অভিষেকবাবু খানিকটা অসহায়। তিনি ঝুলে রয়েছেন। এক প্রান্তে তার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরেক প্রান্তে তিনি নিজে। এই টানাপোড়েনের লড়াই সামলানোর শিক্ষা অল্পবয়সি অভিষেকবাবু এখনও শেখেননি।

কিছু সংবাদমাধ্যমের ধারণা, বিজেপি নেতৃত্ব শুভেন্দুবাবুকে মুখ করেই ২০২৬-এ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে। বহুদিন থেকেই 'রাজ্যপাট'-এর পাতায় এই বিষয়টি উঠে আসছিল। রাজ্যে আসলে মুখের লড়াই। শুভেন্দুবাবু অবশ্যই যোগ্য ব্যক্তি। কারণ মমতাকে কাছ থেকে টক্কর নেওয়া আর হারানোর মুকুট বর্তমানে কেবল তাঁর রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে হেরেই রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১ সালে যেমন হেরেছিল বুদ্ধদেবের দল। শুভেন্দুবাবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কম্পার্টমেন্টাল চিফ মিনিস্টার' বলেন। এই প্রতিবেদকের মতে ওটা 'ফেল' হবে। সবসময় নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে ভোটে জিতেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লড়াই করে নয়। নন্দীগ্রামেই ছিল তাঁর প্রথম লড়াই। আর তাতেই তিনি ফেল। রাজ্য বা জাতীয় ক্ষেত্রে অন্য কোনো কেন্দ্রে লড়াই করার সাহস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাননি। অথচ তৃণমূল একসময় জাতীয় দল ছিল। বিদেশি পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় নারীর অন্যতম প্রভাবশালী মুখ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এটা লক্ষ্য করার যে, পরিবারের সদস্য হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাইন ধরেছেন অভিষেকবাবু। তিনিও ডায়মন্ড হারবারের বাইরে যাবেন না। ওয়াইনাড়, রায়বেরিলি, মেডাক, চিকমাগালুর, আমেঠি আর ফুলপুরের বাইরে যেমন নেহরু পরিবার কোনোদিন যায়নি। মমতার পরিবারও তাই— ভবানীপুর আর ডায়মন্ড হারবার। বালি থেকে তেল হয় না। চাণক্য বলতেন তার জন্য রাজনৈতিক সাহস ও সম্পদ লাগে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেকের কোনোটাই নেই। জওহরলাল, ইন্দিরা বা রাজীবেরও ছিল না। নরেন্দ্র মোদী কিন্তু গুজরাট ছেড়ে বারাণসীতে লড়েছেন ও জিতেছেন। তাই তফাত বোঝা যায়।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

খানিক নীরবতা পালন করুন দিদি

সরবেষু দিদি,

আপনি চুপ করে থাকবেন না জানি। ইদানীং এত কথা বলছেন যে, হিতাহিত জ্ঞান থাকছে না। কিন্তু দিদি জয় করেও ভয় না যাওয়াটা একটা অসুখ। সেই অসুখে আক্রান্ত আপনার দল। কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে আপনার দল। আর তার পরে জয়োল্লাসেও আপনার ভাইয়েরা বোমা মারতে মারতে গেল। বিরোধীদের সবক শেখানোর সেই মিছিল থেকে আসা সকেট বোমা কেড়ে নিয়েছে কিশোরী তামান্নার প্রাণ। ধৃতেরা আদর শেখ, মানোয়ার শেখ, কালু শেখ ও আনওয়ার শেখ। না দিদি, দুষ্কৃতীর কোনো ধর্ম হয় না। কিন্তু দল হয়। বছর দশেকের তামান্না খাতুন রাজনীতি বোঝেই না। চতুর্থ শ্রেণীর পড়ুয়া। বড়ো চাঁদঘর পঞ্চায়েতের মোলান্দা গ্রামের বাসিন্দা তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন বলেছেন, 'আমি দেখেছি কারা বোমা ছুঁড়েছে। ওদের নাম না-জানলেও সকলের মুখ চেনা, সবাই তৃণমূল করে।' গোটা দেশে যখন রক্তপাতহীন ভোট হয় তখন তামান্নার মৃত্যু দেখিয়ে দিল 'বাংলা এখনো বাংলা'তেই রয়েছে। সরকারি ঘোষণা করে গোটা রাজ্যের দু'মিনিট নীরবতা পালন করা উচিত। আমি শুধু ভাবছি, ধৃতদের নাম যদি তারক, কৃষ্ণ, হরিপদ হলে কালীগঞ্জের আগুন কালীঘাটে চলে আসত।

দিদি, তৃণমূল রক্তপাত ছাড়া ভোটে জিততে পারে না! এটা সবার জানা ছিল। এবার এটা জানা গেল তৃণমূল রক্তপাত ছাড়া জয়ের আনন্দও করতে পারে না। অতীতেও দেখেছি, বিরোধীদের উপরে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস ছড়িয়ে জয়ের আনন্দ উদ্‌যাপন করেছে তৃণমূল।

এবারের চিঠি লেখার কথা ছিল অন্য বিষয়ে। আরও তামান্নার মৃত্যুর সম্ভাবনা নিয়ে আসছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বর্ষা। দিদি, আপনি ডিভিসি-কে দোষ দেওয়া কবে শুরু করবেন? ও দিকে আপনি যে বলেছিলেন এই বছরের মধ্যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হয়ে যাবে, সেটার কী হলো?

অভিনেতা দেব কী অভিনয়টাই না জানেন! তাতে আবার আপনি ও আপনার ভাইপো যুক্ত। মনে আছে দিনটা। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪। প্রথমে ক্যামাক স্ট্রিটে ভাইপোর অফিস এবং পরে কালীঘাটে আপনার বাড়িতে বৈঠক সেরে দেব বললেন, আমি রাজনীতি ছাড়লেও, আমার মনে হয় রাজনীতি আমাকে ছাড়বে না। সেই বৈঠকেই নাকি দেব বলেছিলেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকর করা না হলে তিনি ভোটে লড়বেন না। তাঁকে কথাও দিয়েছিলেন আপনি দিদি। দেব দাঁড়ালেন এবং জিতেছেন। কিন্তু ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কী হলো?

বর্ষা এসে গেছে। প্রতিবারের মতো শিলাবতী নদী উপচে ভাসছে ঘাটাল। জল জমা এক ঐতিহাসিক সমস্যা ঘাটালের। ১৯৫৯ সালে মান সিংহ কমিটির রিপোর্টে প্রথম ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা বলা হয়। এই প্রকল্পে সম্মতি দিতে যোজনা কমিশনের ২০ বছর লাগে। তারপর প্রকল্পের সলতে পাকিয়েছিল বামেরা। ১৯৮২ সালে এই প্রকল্পের শিলান্যাস হয়। কিন্তু কাজ হয়নি। দেবের চাপাচাপিতে এবার রাজ্য বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় এই প্রকল্পের জন্য। যদিও খরচ কমপক্ষে দু' হাজার কোটি টাকা। আর ঘোষিত ৫০০ কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে তা কেউ জানে না। এরাজ্যে বাজেট এই রকম হয়। খরচ বলে দেওয়া হয়। টাকা কোথা থেকে আসবে কেউ জানে না। আরও একটা প্রশ্ন দিদি। বছর কয়েক আগে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের জন্য যে দেড় হাজার কোটি টাকা দিয়েছিল সেটা কোথায় গেল? কোন গর্তে ঢুকে গেল সেই টাকা?

তিন বার সাংসদ হয়েছেন দেব। কিন্তু রাজনীতিতে এখনো তিনি শিশু। আপনাকে চেনেইনি। জমিতে আপনি হাত দেবেন না। মাঝে মাঝে পরিদর্শন হবে, সরকারি ফাইল চালাচালি হবে কিন্তু নো জমি অধিগ্রহণ। সেই কারণেই রাজ্যে শিল্প হয় না। চপ শিল্পে তো জমি লাগে না, তাই আপনি রাজি।

আপনার প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যদি জমি প্রয়োজন হয়, তাহলে বাজারমূল্যের থেকে বেশি দামে জমি কেনা হবে। কিন্তু তাতে মন গলেনি দাসপুরবাসীর। তাঁদের অভিযোগ, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে দাসপুরের চন্দ্রেশ্বর খাল খনন করে দাসপুরকে বন্যাকবলিত করার পরিকল্পনা চলছে। শুধুমাত্র ঘাটালকে বাঁচানোর জন্য দাসপুরকে ডোবানোর চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাই যত টাকাই দিক, জমি দেওয়া হবে না।

কিন্তু দিদি জোর করে জমি নিয়ে আপনি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আদৌ বানাবেন কি? আপনি আপনাকে যতদূর জানি, তাতে যে কারণে বামেরা করেনি, সেই কারণেই আপনিও করবেন না। বামেরা জমিতে হাত দিতে ভয় পেত। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শিল্প করতে চেয়ে সিঙ্গুরের জমিতে হাত দিয়েছিলেন। ব্যাস, সেই সিঙ্গুর আন্দোলনকে হাতিয়ার করে ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল। নন্দীগ্রামেও জমি নিয়েই আন্দোলন। আপনি ক্ষমতায় আসার পর নিজস্ব জমি নীতি তৈরি করে আপনার সরকার। সেই নীতি অনুযায়ী জোর করে জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না।

তিন বার সাংসদ হয়েছেন দেব। কিন্তু রাজনীতিতে এখনো তিনি শিশু। আপনাকে চেনেইনি। জমিতে আপনি হাত দেবেন না। মাঝে মাঝে পরিদর্শন হবে, সরকারি ফাইল চালাচালি হবে কিন্তু নো জমি অধিগ্রহণ। সেই কারণেই রাজ্যে শিল্প হয় না। চপ শিল্পে তো জমি লাগে না, তাই আপনি রাজি। □

অতিথি কলম

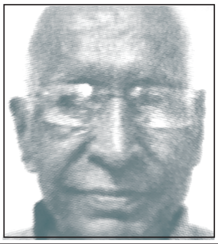

মধুভাই কুলকর্ণী

সঙ্ঘ শাখা মানে সত্যের সাধনা

যে স্থানে শাখা লাগানো হয় সেই স্থানকে আমরা সঙ্ঘস্থান বলি, খেলার মাঠ নয়। সঙ্ঘস্থান তৈরি করে নিতে হয়। সঙ্ঘ শাখা মানেই ভারতমাতার আরাধনা। সেই স্থান, যেখানে ভারতমাতার প্রার্থনা হয় এবং অজ্ঞানের অন্ধকার মোচনকারী ভগবা ধ্বজকে স্থাপন করা হয়। সেই স্থান হওয়া উচিত মন্দিরের মতো স্বচ্ছ, জল দিয়ে ধোওয়া-মোছা, রেখাঙ্কন করে সাজানো-গোছানো।

মন্দিরে যেখানে দেববিগ্রহ থাকে, তাকে গর্ভগৃহ বলা হয়। মন্দির যতই বড়ো হোক না কেন গর্ভগৃহ ছোটোই হয়। গর্ভগৃহে কেবলমাত্র পূজারিই যেতে পারেন। অন্য সকলের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে দর্শনের ব্যবস্থা থাকে।

সঙ্ঘস্থানকে আমরা ভারতমাতার মন্দির মনে করি। সেটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, ধ্বজমণ্ডল (গর্ভগৃহ), সম্পত রেখা (স্বয়ংসেবকদের দাঁড়ানোর জন্য সীমা রেখা), মুখ্যশিক্ষক ও কার্যবাহ দাঁড়ানোর স্থান, জুতা ও বাহন রাখার স্থান প্রভৃতি নির্দিষ্ট করতে হয়। এই ব্যবস্থা দেখে নতুন ব্যক্তির মনে সেই নিয়ম পালনের ইচ্ছা তৈরি হয়। দেবতার পূজার জন্য যেমন পূজার সামগ্রী তৈরি করতে হয়, তেমনি সিটি, রিং, দণ্ড, বল, বসার আসন প্রভৃতি ব্যবস্থা করতে হয়। কবাডি বা খো-খো খেলার রেখাঙ্কন তো উৎসাহবর্ধক পূজার উপকরণ ছাড়া আর অন্য কিছু নয়।

শাখা শুরুর সময় হলেই মুখ্যশিক্ষক দু'বার একটি লম্বা, একটি ছোটো সিটি বাজায়। সিটি বাজানোর মধ্যে মুখ্যশিক্ষকের দক্ষতা প্রকাশ পায়। সিটির বাজলেই সকলে শান্ত হয়ে যায়, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত রকম নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত স্বয়ংসেবক সচেতন হয়ে দাঁড়িয়ে পরবর্তী আজ্ঞার অপেক্ষায় থাকে। অগ্রেসরদের সঞ্চলন করে গিয়ে সম্পত রেখায় দাঁড়িয়ে পড়া এবং মুখ্যশিক্ষক তাদের নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড় করানো, এইসব বিষয় নতুনদের মনে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করে। তারা বুঝতে পারে যে এক বিশেষ স্থানে তারা এসেছে, যা শুধুমাত্র খেলার মাঠ নয়।

শুরুতেই ধ্বজমণ্ডলে ভগবাধ্বজ লাগানো হয়। ধ্বজবাহক ধ্বজমণ্ডলের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। সমস্ত স্বয়ংসেবক ধ্বজ প্রণাম করে। সঙ্ঘ ভগবা ধ্বজকে গুরু হিসেবে স্বীকার করেছে। শ্রীগুরু অর্থাৎ যিনি অন্ধকার দূর করে সত্যের সঙ্গে পরিচয় করান। শ্রীগুরুর মহিমা বর্ণনকারী বহু শ্লোক বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। একটি শ্লোকের শুরুতে রয়েছে 'জ্ঞান মূলং গুরু মূর্তি'। শ্রীগুরুর কেবলমাত্র দর্শনেই সত্যের বোধ জাগ্রত হয়। অসত্যের তথ্যভাণ্ডারকে কেউ জ্ঞান বলেন না।

হিন্দুভূমি হলো ভারত

ভগবাধ্বজ যতখানি প্রাচীন, আমাদের ভারত তার থেকেও প্রাচীন। ভারতীয় জনমানসে ভগবা বা গৈরিক রঙের প্রতি বরাবরই একটা আকর্ষণ রয়েছে। ভগবা রং সূর্যের আগমণের বার্তা নিয়ে আসে। ভারত চিরকালই জ্ঞান অর্থাৎ সত্যের উপাসক। স্বাভাবিক কারণেই স্বাধীন ভারতের সরকারি মুদ্রায় 'সত্যমেব জয়তে' ধ্যেয়বাক্যটি গ্রহণ করা হয়েছে। ভারত হিন্দুভূমি, সেই কারণে হিন্দু স্বভাব অনুসারে 'সত্যমেব জয়তে' ত্রিকালবাধিত সত্য এবং সে কারণেই স্বাধীন ভারতের ধ্যেয়বাক্য। কিন্তু 'ভারত হিন্দুভূমি' বললে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যান। যদি এটি হিন্দুভূমি হয়, তবে কি তা মুসলমান বা খ্রিস্টানদের ভূমি নয়, এ ধরনের প্রশ্ন উঠে আসে। 'সত্যমেব জয়তে'-র মতো সনাতন সত্যের উপর যাদের বিশ্বাস রয়েছে, এই দেশ তাদের সকলের। সত্যের নিরন্তর অনুসন্ধান হিন্দুভূমির বৈশিষ্ট্য। এখানকার ঋষি পরম্পরা, মহাত্মা গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর, গুরু নানকদেব, মহাত্মা বসবেশ্বর, নয়নার ও আলবর প্রমুখ তাঁদের শিষ্যদের সত্যের জ্ঞান দেন। সত্যকে অনুসন্ধানের পথ প্রদর্শন করান। নিরন্তর তপস্যা ও সাধনার দ্বারা সত্যকে সাক্ষাৎকার করার কথা বলেন। মহাত্মা বুদ্ধের বিখ্যাত বাণী হলো, অপ্প দীপো ভব। এখানে আমরা হিন্দু জ্ঞান প্রতিভার দুটিই উদাহরণ গ্রহণ করি। বিশ্বে আর কোনো সূত্র নেই, যার সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে। সূত্রগুলি হলো— (১) একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। (২) ওঁ দৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ শান্তির্ব্রহ্মং শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অনুসন্ধানকারী জ্ঞান পরম্পরার নাম হলো হিন্দু, হিন্দুত্ব। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ত্রিপিটক, জৈনাগম, তিরুক্কুরল ইত্যাদি গ্রন্থে এই জ্ঞান পরম্পরারই মহিমাকীর্তন করা হয়েছে। সাধুসন্ত, প্রবচনকার, কীর্তনকার এই জ্ঞানকেই লোকভাষার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যে পৌঁছানোর কাজ করে থাকেন।

হিন্দুভূমির সাধারণ মানুষের ভাবজগৎ এখানকার জ্ঞান পরম্পরার সঙ্গে জুড়ে আছে। তাকে আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরম্পরা বলতে পারি। তার হিন্দু বা হিন্দুত্ব শব্দের সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই। সমাজ থেকে নিজেদের পৃথক মনে করা 'অতি বুদ্ধিমান' লোকেদের হিন্দু, হিন্দুত্ব, হিন্দুভূমি, হিন্দুরাষ্ট্রের মতো শব্দগুলি গলা দিয়ে নামে না। তাদের হিন্দু শব্দটাতেই অরুচি। সঙ্ঘ সাধারণ মানুষদের নিয়ে কাজ করছে। রেখাঙ্কন করে 'ভারত'-কে মানচিত্রে দেখানো যেতে পারে, কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্র একটি গুণবাচক শব্দ। তাকে কাগজে ছবি এঁকে দেখানো সম্ভব নয়। ভারতের মানচিত্রে 'ভারত হিন্দুরাষ্ট্র' কথাটা লেখা যেতে পারে।

ভারত হিন্দুরাষ্ট্র বলেই তা পুণ্যভূমি। সারা বিশ্বে পুণ্যভূমি বলার যোগ্য ভূমি তো একটিই রয়েছে, আর তা হলো ভারত। স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলেছেন। তাঁর দৃঢ় মত ছিল, ভারতমাতাই হোক একমাত্র আরাধ্য দেবতা, কেননা জ্ঞানের সর্বপ্রথম উদয় এই ভারতভূমিতেই

হয়েছিল।

ধ্বজ প্রণামের পর শাখায় শারীরিক ও বৌদ্ধিক কার্যক্রম হয়। সকলের মধ্যে স্বয়ংসেবকত্ব বিকশিত হোক তার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। সত্যনিষ্ঠা ও রাষ্ট্রনিষ্ঠা এই দুটি স্বয়ংসেবকের মধ্যে স্ফুরণ হওয়াই বাঞ্ছনীয় (সত্যনিষ্ঠা মানে সত্য কী, তা জানার ইচ্ছা)। স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সমাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার কৌশল থাকা চাই। সবার সঙ্গে মিলেমিশে, সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার দক্ষতা ও আগ্রহ থাকা চাই। ভারতমাতার প্রতি অসন্দিগ্ধ নিষ্ঠা থাকা চাই। পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজী বলতেন— 'কোনো সন্দেহ নয়, কোনো চাহিদা নয়, ইদং রাষ্ট্রায়, ইদং ন মম। ভারতমাতা সকলের কুলদেবী। ব্যক্তিত্ব, মান-সম্মান, শ্রদ্ধা, পুরস্কার — সব কিছু ভারতমায়ের চরণে অর্পণ করতে হবে।' স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।'

সঙ্ঘের ভিত্তি স্বয়ংসেবক

স্বয়ংসেবক হলো সঙ্ঘের ভিত্তি। সঙ্ঘের শাখা চালানোর উদ্দেশ্যই হলো স্বয়ংসেবকের সংখ্যা নিরন্তর বৃদ্ধি করা। বর্তমানে দেশে ৮০ হাজার শাখা চলছে। তাদের সকলের চেষ্টাই হলো নতুন স্বয়ংসেবক নির্মাণ। শরীরে রক্তকোষের যে ভূমিকা রয়েছে, ঠিক সেই ভূমিকা রয়েছে রাষ্ট্ররূপী শরীরে মধ্যে স্বয়ংসেবকদের। নির্দিষ্ট পরিমাণে শরীরে রক্ত থাকা জরুরি, তাতে শরীর সুস্থ, সুদৃঢ় ও কর্মক্ষম থাকে। রাষ্ট্র শরীরে স্বয়ংসেবক যদি নিশ্চিত পরিমাণে থাকে তবে রাষ্ট্র শরীর (আরোগ্যসম্পন্ন) সুস্থ, সুদৃঢ় ও কর্মক্ষম থাকবে। সমৃদ্ধি ও সুখ (পরম বৈভব) প্রাপ্ত হবে। স্বয়ংসেবকদের নিশ্চিত পরিমাণে প্রয়োজনীয় সংখ্যাকে সঙ্ঘ প্রার্থনাতে 'বিজেত্রী চ নঃ সংহতা কার্যশক্তিঃ' বলা হয়েছে। স্বয়ংসেবকদের সংগঠিত, বিজয়শালিনী কার্যশক্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিরন্তর সচল রয়েছে। শাখা বিস্তার, স্বয়ংসেবক বৃদ্ধি, এই কাজই সঙ্ঘ করে চলেছে।

রাষ্ট্রীয়তা মানে কী?

সঙ্ঘশাখা মানে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের ত্রিবেণীধারা, তার উদ্গামস্থল। প্রতিদিন একবার সেই ত্রিবেণীসঙ্গমে গিয়ে অবগাহন করা উচিত। ভারতমাতার প্রতি অনন্য ভক্তি, ভারত হিন্দুরাষ্ট্র, এসবের জ্ঞান এবং 'বিজেত্রী চ নঃ সংহতা কার্যশক্তিঃ' দাঁড় করানোই কাজ।

স্বাধীনতার জন্য সমস্ত রকম আন্দোলনে ডাক্তারজীর মুখ্যরূপে অংশগ্রহণ দেখা যেত। বেঙ্কটেশ থিয়েটারে তাঁর সম্মানে আয়োজিত সভা একবার খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেখানে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, বিঠ্ঠল ভাই প্যাটেল, হাকিম আজমল খান, ডাঃ আনসারি, রাজাগোপালাচারী প্রমুখ বড়ো বড়ো ব্যক্তি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে দেশ স্বাধীন হওয়া উচিত, এই বিষয়টি সার্বজনিক রূপ নেয়, কিন্তু স্বাধীনতা মানে কী? রাষ্ট্রীয়তা মানে কী? এই বিষয়ে আলোচনার মধ্যে কোনো গভীরতা ছিল না। স্বাধীনতার আন্দোলন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয়ত্বের স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এমনটা তাঁর মতে হয়। এই জন্যই ডাক্তারজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামে এক নতুন কাজের শুভারম্ভ করেন।

সঙ্ঘে যোগদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকা স্পষ্ট হোক, তারজন্য ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে স্বয়ংসেবকদের একটি প্রতিজ্ঞা নিতে হতো— 'সর্বশক্তিমান শ্রী পরমেশ্বর এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমাদের পবিত্র হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু সমাজের সংরক্ষণ করে হিন্দুরাষ্ট্রকে স্বাধীন করার জন্য আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন ঘটক হয়েছি।' এর মধ্যে তিনি বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতার জায়গা রাখেননি। হিন্দুরাষ্ট্র শব্দের প্রয়োগ কোনো প্রতিক্রিয়া রূপে ব্যবহার করা হয়নি। হিন্দু সংস্কৃতি এই রাষ্ট্রের প্রাণ। 'ভারত হিন্দুরাষ্ট্র', এমন বলার সময় ভারতের তুলনা ইসলাম, খ্রিস্টান বা ইহুদি দেশের সঙ্গে করা হয় না।

বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, জৈনাগম, ত্রিপিটক, গুরু গ্রন্থসাহেব — জ্ঞানের এই ভাণ্ডারকে নিজের বলা একজনও হিন্দু যদি বেঁচে থাকে, তখনও পর্যন্ত এদেশকে হিন্দুরাষ্ট্র বলা হবে। কারও মুসলমান হওয়া বা না হওয়ার সঙ্গে হিন্দুরাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক নেই। হিন্দু ভারতের সনাতন জ্ঞান পরম্পরার নাম, যা সকলের মঙ্গল কামনা করে।

ডাক্তারজী 'হিন্দু' শব্দের ব্যাপারে কোথাও কোনো বাদ-বিবাদ করেননি। তিনি তাঁর শুদ্ধ, নির্মল অন্তঃকরণ ও প্রেমের সঙ্গে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি বহু বিখ্যাত মানুষেরও মন জয় করেন। ১৯৪০ সালেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ অখিল ভারতীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। আর তা এই কারণেই সম্ভব হয়, কেননা ডাক্তারজী ছিলেন সন্ততুল্য মহাপুরুষ। সকলের হিতচিন্তক এমন ব্যক্তিই পারে যুগপ্রবর্তকের কাজকে বাস্তব রূপ প্রদান করতে। তিনি হিন্দুরাষ্ট্রের উপর কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক রচনা করেননি। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের নিরন্তর সাধনার জন্য সঙ্ঘ শাখার সৃষ্টি করেন। সত্যের বোধ সকলের হোক, এই ঈশ্বরীয় কাজই আমরা করছি।

অপরের জন্য চিন্তা

অধ্যাত্ম মানে কী? এই প্রশ্নের উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ সহজ সরল ভাষায় দিয়েছেন, 'অপরের মঙ্গল চিন্তা করাই হলো অধ্যাত্ম।' সঙ্ঘের শাখায় অপরের মঙ্গল চিন্তা করারই সংস্কার পাওয়া যায়। গটনায়ক, গণশিক্ষক, মুখ্যশিক্ষক, কার্যবাহ প্রভৃতি দায়িত্বে থেকে কাজ করতে গিয়ে স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা যেমন যেমন বৃদ্ধি হয়, তেমন তেমন তাদের অপরের প্রতি মঙ্গল চিন্তার পরিধি বৃদ্ধি পায়। শিশু, বালক, তরুণ, প্রৌঢ় এই রকম প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের চিন্তা করার স্বভাব সঙ্ঘ শাখায় তৈরি হয়। 'আমার শাখায় যাওয়ার ফলে রাষ্ট্র শক্তিশালী হবে', এই ধারণা নিয়ে স্বয়ংসেবকরা শাখায় আসে। কোনো রকম স্বার্থের ভাবনা তাদের মনকে স্পর্শ করতে পারে না। সঙ্ঘ শাখা অধ্যাত্ম সাধনার সহজ পথ। এই বিষয়ে সন্ত তুকারামের বাণীর উল্লেখ করাটা প্রাসঙ্গিক হবে–- 'সন্তগণ বিশ্ব কল্যাণের জন্য বহু কষ্ট করে থাকেন। প্রাণীমাত্রের উপর দয়াই সন্তজনের পুঁজি, তাই তাঁরা নিজের শরীরেরও চিন্তা করেন না।'

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

গত ১১ বছরে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে দেশের ২৭ কোটি মানুষ

অর্থনীতিতে 'ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন' বলে একটা কথা আছে। অর্থাৎ দেশের অর্থব্যবস্থায় মানুষকে যুক্ত করা, যে বিষয়টি মানুষের জীবনের অর্ধেক সমস্যার সমাধান করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে থাকা মানুষের জন্য চালু করেন জনধন অ্যাকাউন্ট প্রকল্প। সঙ্গে দেন একটি জীবন বিমা ও দুর্ঘটনা বিমার সুবিধা। কিছুদিন পর চালু করেন চিকিৎসা বিমা। এর ফলে একজন গরিব মানুষের জীবনের সুরক্ষার মানেই পাল্টে যায়। জনধন অ্যাকাউন্টগুলিকে জুড়ে দেওয়া হয় আধার ও মোবাইল নম্বরের সঙ্গে। এরপর বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ টাকা ১০০ শতাংশ পেতে শুরু করে গরিব মানুষ, যা রাজীব গান্ধীর সময় ১৫ শতাংশ পেত। কোভিডের সময় এই ব্যবস্থা না থাকলে দেশের প্রান্তিক মানুষদের কাছে কীভাবে টাকা পৌঁছে দিত নয়াদিল্লি? এরপর শুরু হয় ইউপিআই ব্যবস্থা এবং রুপে কার্ড। ইউপিআই-এর মাধ্যমে অনলাইন লেন-দেন চালু হলে ব্যাংকের কাছে নগদ টাকার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ব্যাংকগুলি সেই টাকা কম সুদের হারে দেওয়া শুরু করে কৃষক, ছোটো ব্যবসায়ী বা নতুন ব্যবসা, ছোটো উদ্যোগ শুরু করা নারীশক্তিকে। যে গরিব মানুষ মহাজনদের থেকে চড়া সুদে ধার নিয়ে এতকাল ব্যবসা করত, তাঁরা এবার সরকারি অর্থব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হলো। ব্যাংক থেকে কম সুদে তাঁদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (ব্যবসার পুঁজি) পাওয়া শুরু হলো। কমলো তাঁদের ব্যবসার ঝুঁকি। এর ফলে প্রভাব পড়ল প্রতিটি পণ্য ও পরিষেবার মূল্যে। ফলে নিয়ন্ত্রণে এলো দেশের মুদ্রাস্ফীতি। ধীরে ধীরে দেশের প্রতিটি কৃষককে দেওয়া হলো কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড। দেশের মহাকাশ গবেষণার উন্নতির সুবিধা পেল কৃষিক্ষেত্রও। কৃষকদের জন্য কৃষি বিমার ব্যবস্থা করা হলো এবং সেই ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো আধুনিক রিমোট সেন্সিং ব্যবস্থা।

২০২০ থেকে দেশের ৮০ কোটি মানুষকে রেশনের মাধ্যমে বিনা মূল্যে চাল, গম দেওয়া শুরু হলে গরিব মানুষ সেই টাকা সাশ্রয় করে কেনা শুরু করে প্রোটিন ও ফল। ২০২০-র পরে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ডিম, চিকেন এবং বিভিন্ন ফলের বিক্রি বাড়তে থাকে। ফলে জনস্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটতে থাকে। এর সঙ্গে গ্রামীণ ক্ষেত্রে জৈব কৃষি, পশুপালন, গোপালন, মৎস্যচাষের সুযোগ বাড়তে থাকে এবং মানুষের হাতে আরও অর্থ আসে।

'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে উচ্চমানের এডুকেশন টেকনোলজি কোম্পানির সংখ্যা বাড়তে থাকে। অনলাইন এডুকেশনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যায় কোটা, হায়দরাবাদ, দিল্লির সেরা শিক্ষাব্যবস্থা। গত চার বছর ধরে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে ছেলে-মেয়েরা সিভিল সার্ভিস, আইআইটি এবং নিট পরীক্ষায় ভালো ফল করে তাঁদের পরিবারগুলিকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যের হাত থেকে উদ্ধার করেছে।

ভারত সরকার বর্তমানে আরব সাগর, ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগরে শক্তির উৎসের (তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের) সন্ধান চালাচ্ছে। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকার বিভিন্ন খনির মালিকানার জন্য চীন ও আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ভারত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জলপথের অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের মালিকানা নিচ্ছে বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানি, সেখানে গড়ে উঠছে ভারতীয় নৌ ও বিমানবাহিনীর ঘাঁটি। ভারত সরকার এবং বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানি বিনিয়োগ করছে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। ফলে বাড়ছে ব্যবসা ও কাজের সুযোগ।

পরিকাঠামো ক্ষেত্র, লজিস্টিক্স এবং কোল্ড স্টোরেজ শিল্পে এই এগারো বছরে বিপুল বিনিয়োগ করেছে ভারত। কেন্দ্রীয় বাজেটে মূলধনী খাতে ১০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ ছাড়িয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে। সড়কপথ, জলপথ, আকাশপথ, রেল ব্যবস্থায় বিপুল বিনিয়োগ শুধু হয়নি, এসেছে নতুন প্রযুক্তি। এর ফলে যাতায়াতের সময় কমেছে। প্রত্যন্ত গ্রামগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলেছে দেশের বন্দর ও বিমানবন্দর। এনার্জি (শক্তি) ক্ষেত্রেও আত্মনির্ভরতার দিকে হেঁটে চলেছে দেশ। সৌরশক্তি থেকে বায়ুশক্তি— সব ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করেছে ভারত। এই সেক্টরেও কর্মসংস্থান হয়েছে বহু লোকজনের। দেশের অধিকাংশ গ্রামে পৌঁছে গিয়েছে বিদ্যুৎ। রান্নার গ্যাসের সংযোগ পেয়েছেন কোটি কোটি মা-বোন।

শেষে অবশ্যই করতে হবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের উল্লেখ। স্বাধীনতার পর প্রথম ৪৪ বছর প্রায় সব শিল্প পণ্য ও পরিষেবা বিদেশ থেকে কিনত ভারত। ১৯৯১ থেকে পরিষেবা (মূলত সফট্ওয়্যার) বিক্রি শুরু করে কিছুটা নিজের পায়ে দাঁড়ায় দেশ। কিন্তু প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, মহাকাশ গবেষণায় প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী, রেল ইঞ্জিন ও বগি, পরিবহণ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন সামগ্রী, ইলেকট্রনিক্স, ওষুধের উপাদান, সার, ভোজ্য তেল ইত্যাদি বহু পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করত ভারত। এর ফলে চীন, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে যে, উৎপাদন শিল্পে স্বনির্ভর হবে ভারত এবং সারা পৃথিবীকে পণ্য বেচবে দেশ। যাতে ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। আজ প্রতিরক্ষা সামগ্রী, মহাকাশ সংক্রান্ত পরিষেবা থেকে মোবাইল ফোন বিদেশে রপ্তানি করছে ভারত। কাজ ও ব্যবসার সুযোগ পেয়েছে কোটি কোটি মানুষ। সরকারের হাতে এসেছে বিদেশি মুদ্রা। লাভের মুখ দেখেছে ব্যাংক। বেড়েছে মানুষের আয়। শক্তিশালী হয়েছে বাজার।

আগামীদিনে আসছে কিছু ক্ষেত্রে নানারকম সংস্কার। দারিদ্র্য সম্পূর্ণ নির্মূল হওয়া সময়ের অপেক্ষা। কৃষি, কৃষি বিপণন থেকে উদ্ভাবন— প্রতিটি ক্ষেত্রে তৈরি হতে চলেছে অপরিসীম সুযোগ। আগামী ২৫ বছরে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। কিন্তু এর জন্য দেশের পুলিশ- প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি হওয়া ঘুঘুর বাসা ভাঙা বিশেষ প্রয়োজন। □

ভারতের আকাশে আপন আলোয় উদ্ভাসিত এক মহা জ্যোতিষ্ক ড. শ্যামাপ্রসাদ

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

কথায় আছে যার জীবনের ছায়া যত দীর্ঘ তিনি তত বড়ো মহাপুরুষ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এমন এক মহাজীবন যাঁর সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডের ছায়া ভারতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে প্রায় ৬০-৬৫ বছর ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেস এবং তার দোসর বামপন্থী দলগুলি মধ্য গগণে বিরাজিত ছিল। তারা শ্যামাপ্রসাদের মতো এক সূর্যসম উজ্জ্বল জোতিষ্ককে যেভাবে গ্রাস করে রেখেছিল তাতে মনে হচ্ছিল তা থেকে তাঁর মুক্তি অসম্ভব। তিনি বুঝি কালের গহ্বরে তলিয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁর রুদ্র তেজের ছটায় এদেশে ধীরে ধীরে কংগ্রেস ও বামপন্থী ভাবধারার অবলুপ্তির ফলে তাঁর মতাদর্শের উপর জমে থাকা আঁধার ঘুচে তাঁর মহিমান্বিত রূপ প্রকটিত হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের পাণ্ডিত্য, তাঁর কর্মজীবন, তাঁর মানব প্রীতি, হিন্দুজাতির প্রতি অপার শ্রদ্ধা, সর্বোপরি তাঁর স্বদেশপ্রেম, দেশের অখণ্ডতার প্রতি আপোশহীন সংগ্রাম এবং শেষপর্যন্ত তাঁর জন্য তাঁর আত্মত্যাগ আজ তাঁকে শুধু বাঙ্গালি ভারতবাসীর কাছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

ইতিহাস শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে বড়ো অন্যায় করেছে। এক প্রখর দেশভক্ত, যথার্থ শিক্ষাবিদ, সিদ্ধান্তের প্রতি যার অবিচলনিষ্ঠা, সত্য ও ন্যায়ের জন্য যিনি মুহূর্তে মন্ত্রিত্বের মোহ হেলায় ত্যাগ করতে পারেন, এমনকী প্রয়োজনে দেশের জন্য, দেশের অখণ্ডতার জন্য প্রাণ বলিদানও দিতে সদ্য প্রস্তুত, এমন রাজনেতা দেশভক্ত শ্যামাপ্রসাদকে ইতিহাস কি সত্যি মনে রেখেছে? কোনো ব্যক্তি যখন কাজ করেন তখন তিনি একেবারের জন্যও ভাবেন না যে ভবিষ্যতে ইতিহাস তার কী মূল্যায়ন করবে। যিনি প্রসিদ্ধির জন্য নয়, ন্যায়ের জন্য, সমাজের জন্য কাজ করেন তিনি মোটেই ভাবেন না যে ভবিষ্যতে ইতিহাস তাঁকে মনে রাখবে কিনা? পরীক্ষা তো ইতিহাসের, ইতিহাসবিদদের, তাঁরা এমন মহান ব্যক্তিত্বকে মূল্যায়ন করতে পেরেছেন কিনা? সেই মহাপুরুষকে মনে রাখতে পেরেছেন কিনা? আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশের ইতিহাসবিদরা শ্যামাপ্রসাদকে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। আমাদের আরও দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুগে ইংরেজরা এদেশের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে প্রচার করেছে, আর স্বাধীনতার পরে এদেশের বাম-কংগ্রেস ইতিহাসকাররা এদেশের প্রকৃত মহাপুরুষদের দেশবাসীর থেকে লুকিয়ে রেখেছেন অথবা ভুলভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এখন ভারতবাসীর সে ভ্রম সংশোধনের পালা।

তিনটি কারণে শ্যামাপ্রসাদ ভারতবাসীর মনে সতত ভাস্বর হয়ে থাকবেন। এক, দেশ বিভজনের কালে তার অবিস্মরণীয় অবদান। দুই, ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা। তিন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ও ভারতভুক্তিতে তার বলিদান। তাঁর জীবনের এই তিনটি কর্মকাণ্ড প্রত্যেক বাঙ্গালির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করা উচিত। ১৯০৫ সালে বড়লাট কার্জন বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে বড়ো আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছিল, যার পুরো ভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মের অধিকাংশই জানে না যে ১৯৪৭ সালে আর একবার এই বঙ্গকে ভাগ করতে এক বড়ো আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। সেদিন সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কথাটি কেমন দেশ বিরোধী লাগছে না? কিন্তু সেদিন যদি ওই আন্দোলন সংঘটিত না হতো তবে আজ এই কলকাতা-সহ পুরো পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অঙ্গরাজ্য না হয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

> “স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরে দেখা যাচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের অন্য সব ধারাকে ছাপিয়ে শ্যামাপ্রসাদের আদর্শ ও সাধনা জয়যুক্ত হয়েছে। নেহরু-গান্ধী ঐতিহ্যের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে শ্যামাপ্রসাদের মতাদর্শ।”

১৯৪৬ সাল। ইংল্যান্ডে লেবার পার্টির সরকার। এটলি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। হলেন ঠিক হলো ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়েই দেশভাগের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সেদিন কংগ্রেস যদি ক্ষমতা পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো না করত তবে হয়তো কোনোদিনই ভারত ভাগের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু জওহরলাল আর জিন্নার ক্ষমতা দখলের মোহ ভারত ভাগ নিশ্চিত করে ফেলেছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, জওহরলাল সেদিন জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনে সায় দিয়ে দিলেন। সেসময় বঙ্গ ও পঞ্জাব এমন দুটি প্রদেশ ছিল যেখানে মুসলমানরা বেশি সংখ্যায় ছিল। সেই সময় এমন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল সম্পূর্ণ বঙ্গ ও পঞ্জাব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এমন সময় শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের তিনদিনের সম্মেলনে ডেকেছিলেন। প্রস্তাব রেখেছিলেন যদি

ফঃ ২

শেষপর্যন্ত ভারত ভাগ হয় তবে বঙ্গ ও পঞ্জাবও বিভাজিত হোক। নাহলে বাঙ্গালি হিন্দুর কী হবে? বঙ্গ ভাগ হোক পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তিতে। পুরো বঙ্গ কখনোই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। সে দাবি আদায়ে তিনি বড়ো আন্দোলন শুরু করলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা সে সময় এক সমীক্ষা করেছিল। ৯৮.৯ শতাংশ হিন্দু বঙ্গ বিভাজনের পক্ষে রায় দিয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ মাউন্টব্যাটেন, গান্ধীজী ও কংগ্রেসের তৎকালীন বড়ো বড়ো নেতাদের সঙ্গে দেখা করে বাঙ্গালি হিন্দুর পক্ষ নিয়ে বঙ্গ ভাগের দাবি জানিয়েছিলেন। তারই পরিণাম স্বরূপ ১৯৪৭ সালে দেশভাগের কালে বঙ্গ ভাগ স্বীকার করে হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ড হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ আত্মপ্রকাশ করেছিল। যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ বাঙ্গালি হিন্দুরা নিজেদের পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি বলে পরিচয় না দিয়ে ভারতীয় বলে গর্ব করতে পারি। এর সম্পূর্ণ শ্রেয় যদি কোনো একক ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তার নাম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

শ্যামাপ্রসাদের দ্বিতীয় কীর্তি, তিনি তখন হিন্দু মহাসভার সভাপতি। স্বাধীনতার পরে গান্ধীজীর ইচ্ছায় দেশে সর্বদলীয় সরকার গঠিত হলো। শ্যামাপ্রসাদ হলেন শিল্পমন্ত্রী। সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশে নতুন নীতি নির্ধারণের কাজ শুরু হয়েছে। দেশ কোন পথে চলবে, শিক্ষানীতি কী হবে, কৃষিনীতি কী হবে, অর্থনীতি কী হবে, শিল্পনীতি কী হবে, বিদেশ নীতি কী হবে তার নীতি-নির্ধারণ। জওহরলালস নেহরু মন্ত্রীসভার কাজ শুরু করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ কংগ্রেসের এই প্ল্যানিং দেখে মোটেই খুশি ছিলেন না। তাঁর মনে হয়েছিল আমরা ইংরেজদের থেকে স্বাধীনতা তো পেয়েছি, কিন্তু দেশ আগামীদিনে কোন নীতির উপর ভর করে এগিয়ে চলবে? পাশ্চাত্য চিন্তাধারার উপর নাকি দেশীয় ভাবধারার উপর নির্ভর করে? শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন ভারত যদি ব্রিটিশ মডেলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে বিরাট ভুল হবে। দেশ অদূর ভবিষ্যতে প্রথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। তিনি মনে করতেন এই দেশের নীতি এই দেশের মাটি থেকে উত্থিত হওয়া উচিত। এই দেশের অর্থনীতি এদেশের হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা এক প্রবহমান ধারা, এই দেশের কৃষি নীতি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন কৃষি ব্যবস্থার অঙ্গ, এই দেশের বিদেশনীতি 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর দর্শন— যা এদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়। দেশের নীতি দেশের মাটির সোঁদা গন্ধ থেকে উঠে আসা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রাচীন ভারতের সব কিছুর মধ্যে পশ্চাৎপদতা দেখতেন। তিনি স্বাধীনতার পরে দেশের প্রাচীন মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে এদেশের রীতিনীতি ইংল্যান্ড থেকে ইমপোর্ট করা জ্ঞানের ভিত্তিতে করতে চাইলেন।

শ্যামাপ্রসাদ তখন নেহরু মন্ত্রীসভায় শিল্পমন্ত্রী। দেশভাগের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল পূর্ববঙ্গে থেকে উদ্বাস্তু হওয়া হিন্দুদের ওপর। কিন্তু পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়া হিন্দুদের চরম দুর্দশা দেখা দিল। বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছিল, হিন্দু ঘরের মা-বোনেদের ধর্ষণ করা হচ্ছিল, মঠ মন্দির ভেঙে মসজিদ করা হচ্ছিল, হিন্দুর মান-ধন-প্রাণ সব জেহাদি মুসলমানদের করুণার উপর নির্ভরশীল ছিল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরায় চলে আসতে বাধ্য হচ্ছিল। এমন সংকটজনক সময়ে 'নেহরু-লিয়াকত' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঠিক হলো ভারত পাকিস্তান নিজের নিজের দেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেবে, কোনো দেশ অন্যের বিষয়ে নাক গলাতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে ভারত তো এদেশের মুসলানদের পুরো মাত্রায় সুরক্ষা দিচ্ছিল কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুরা ধনে-প্রাণে মারা পড়তে লাগল। আর অদ্ভুতভাবে নেহরু তাদের সুরক্ষার ব্যাপারে কোনো কথাই শুনতে রাজি ছিলেন না। শ্যামাপ্রসাদের ইচ্ছা ছিল নেহরু এই বিষয় ভারত বিশ্বমঞ্চে তুলুক এবং এর সমাধান করুন। কিন্তু নেহরু একে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে বলে এড়িয়ে গেলেন। এর প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫০-এ নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। হিন্দু বাঙ্গালির স্বার্থ রক্ষায় এত বড়ো আত্মত্যাগ কেউ কোনোদিন করেছে বলে জানা নেই। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করে হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ তৈরি তারপরে বাঙ্গালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের উপর চরম অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেহরু মন্ত্রীসভা ত্যাগ— হিন্দু বাঙ্গালিপ্রেমী বঙ্গের ইতিহাসে বিরল।

সাংবাদিকরা শ্যামাপ্রসাদকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার ও নেহরুর চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য কী? ছোট্ট উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'নেহরু এদেশ নবনির্মাণ করতে চান, আমি এদেশের পুনর্নির্মাণ করতে চাই'। কংগ্রেস চেয়েছিল দেশকে নতুন করে তৈরি করতে, তাদের মতে এ দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি সবকিছু পুরানো হয়ে গেছে। এ কোনো কাজে লাগবে না। তাকে বাতিল করে নতুন ভাবে দেশ গড়া উচিত। সেজন্যে তারা গান্ধীকে জাতির জনক বা রাষ্ট্রপিতা বলে সম্বোধন করেছিল। তাদের স্লোগান ছিল 'নেশন ইন মেকিং'। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মনে করতেন ভারতের জন্ম আজ হয়নি। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন দেশ এই ভারতের যা কিছু পুরনো, শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্ম-ঐতিহ্য সব ভারতকে এক সময় বিশ্বশ্রেষ্ঠ বানিয়েছিল। হাজার পরাধীনতায় তার ওপর ধূলি জমেছে, গরিমা নষ্ট হয়েছে মাত্র। তার মানে এই নয় সেগুলি বাতিল হয়ে গেছে। সেই ঐতিহ্যগুলির পুনর্জাগরণের দ্বারাই আবার দেশ বিশ্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। দেশ কখনো তার মূল দর্শনকে বাদ দিয়ে এগোতে পারে না।

ভারত কখনো কলোনিয়াল কান্ট্রির আদর্শ নিয়ে চলতে পারে না। যে দেশের কোনো প্রাচীন ইতিহাস বেঁচে নেই, যাদের ভাষা বেঁচে নেই, যাদের সংস্কৃতি অবশিষ্ট নেই, ভারতবাসী সেই আফ্রিকা, আমরিকা, মিশর, আরবের মতো পারে মতবাদ নিয়ে বাঁচতে পারে না। আমাদের ভাষা সংস্কৃতি সংগীত ইতিহাস প্রাচীন। হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস যদি না করি, তবে বিশ্ব আমাদের কখনো সম্মান দেবে না। মন্ত্রীসভা ছাড়ার পরে তিনি বহু পণ্ডিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন, অবশেষে ১৯৫১ সালে দিল্লির রাঘোমল আর্য কন্যা বিদ্যালয়ে 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' নামে এক নতুন ভাবধারার রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করলেন। এ ছিল তার জীবনের সর্ববৃহৎ মহান কর্ম। সে সময়ে কোনো মূর্খও বিশ্বাস করত না যে এই জনসঙ্ঘ একদিন ভারতবর্ষের

কোণায় কোণায় পৌঁছে যাবে, তারা ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে, এই জনসঙ্ঘ একদিন দেশ পরিচালনার দয়িত্ব গ্রহণ করবে।

কারণ সেদিন তাঁর সঙ্গে না ছিল কোনো বড়ো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, না ছিল কোনো বিচক্ষণ সহযোগী। সঙ্গে ছিল মাত্র আট-দশ জন রাজনীতি অনভিজ্ঞ যুবক। দীনদয়াল উপাধ্যায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী, এল কে আদবাণী, কুশভাও ঠাকরে, জগদীশপ্রসাদ মাথুর— এইরকম কয়েকটি সদ্য তরুণ। এদের দিয়েই শুরু হয় জনসঙ্ঘের যাত্রা। কংগ্রেস তথা নেহরু-সূর্য তখন মধ্য গগনে। তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা ও কিছু করা অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। সেই সময় কে ভাবতে পারে যে জনসঙ্ঘ আগামী দিনে ক্ষমতায় আসতে পারে? আসলে তিনি ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, দেশের সামনে এক নতুন রাজনৈতিক দিশা ও বিচারধারা— এক বিকল্প নীতি রাখতে চেয়েছিলেন। হতে পারে ৫-১০-১৫-২৫-৫০ বছর পরে এ নীতি মানুষ গ্রহণ করবে, মানুষ বিচার করবে দেশের জন্য কোনটা সঠিক পথ। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত হলো জনসঙ্ঘের মূলনীতি নির্ধারণের ভার। তৈরি হলো একাত্ম মানবদর্শন। শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে জনসঙ্ঘের জন্ম হতো না, জনসঙ্ঘ না সৃষ্টি হলে একাত্ম মানবদর্শনের সন্ধানও এদেশের রাজনীতি পেত না। সে শুধু সাম্যবাদ, সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, গান্ধীবাদ আর মার্কসবাদের অন্ধ গলির মধ্যে মাথা খুঁড়ে মরতো। দেশ কখনো তার মূল আদর্শের পথে ফিরতে পারত না। জনসঙ্ঘের স্থাপনা করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশের সেই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার কাজটি করে গেছেন। সেদিনের ১০ সদস্যের ছোট্ট জনসঙ্ঘ আজ ১১ কোটি সদস্যের পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। তার একমাত্র কারণ শ্যামাপ্রসাদের মহান তপস্যা।

তাঁর তৃতীয় কীর্তি হলো জম্মু-কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারত ভুক্তি। স্বাধীনতার পরে কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহ যখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন— তারা পাকিস্তানে যাবেন, স্বাধীন থাকবেন, নাকি ভারতে মিশে যাবেন, এরকম সময়ে পাকিস্তান কাশ্মীরে সেনা অভিযান করে দিল। বিপদে পড়ে হরি সিংহ ভারতে বিলয় হতে চুক্তিবদ্ধ হলেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলো। পাকিস্তান সেনা যখন পিছু হঠছে, ভারত বিজয়ের দোরগোড়ায়, তখন হঠাৎ অকারণে জওহরলাল যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে দিলেন। এমন অদূরদর্শী ঐতিহাসিক ভুল পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে জানা নেই। জওহরলাল যদি সেই সময় যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা না করতেন তবে আজ জম্মু-কাশ্মীরের কোনো সমস্যাই থাকতো না। কিন্তু ব্যক্তিগত ও ক্ষমতা প্রদর্শন করতে এবং নিজেকে আন্তর্জাতিক নেতা বলে জাহির করতে যুদ্ধ স্থগিত করা হলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরে জন্য সংবিধান ৩৭০ ধারা চালু-সহ অনেক অপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ঠিক হলো কাশ্মীরে যেতে হলে ভারত সরকারের 'ইনার-পারমিট' নিতে হবে।

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলে ডাকা শুরু হলো। কাশ্মীরের রাজ্যপালকে সদর-এ-রিয়াসাত বা রাষ্ট্রপতি বলে সম্বোধন করা শুরু হলো। আর কাশ্মীরের জন্য আলাদা একটি পতাকার স্বীকৃতিও দিল কংগ্রেস সরকার। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। সারাদেশে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। 'এক দেশে দুই নিশান, দুই বিধান, দুই প্রধান চলবে না'। এই স্লোগান তুলে কাশ্মীর অভিযানের করার মনস্থ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ (ওমর আব্দুল্লার পিতা) ও জওহরলাল বেগতিক দেখলেন। তাঁরা এই আন্দোলন কেবল স্তব্ধ করে দিতেই চাইলেন না, বরং শ্যামাপ্রসাদকে তাদের পথ থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে পর্দার আড়ালে অন্য এক চক্রান্ত রচনা করলেন। বলা হলো কাশ্মীর যাওয়ার জন্য তাঁর কোনো পারমিট নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি নির্ভাবনায় কাশ্মীরে যেতে পারেন। কিন্তু কাশ্মীরে প্রবেশ মাত্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। তাঁকে ভারত সরকারের পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হলো। তারপর সেফ হাউসের নামে কাশ্মীরের সেই প্রবল ঠাণ্ডায় এক জানালা-দরজাবিহীন অস্বাস্থ্যকর এক ঘরে তাঁকে রেখে দেওয়া হলো। যখন তার শরীর ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করল সাধারণ জিপে চড়িয়ে এক হাসপাতলে গাইনোলজি ওয়ার্ডে তাকে রাখা হলো। ১৯৫২ সালের ২৩ জুন এখানেই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হলো তাঁর।

এ বলিদান দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বলিদান। তাঁর এই বলিদান কাশ্মীরের অনেকগুলি সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গেল। শ্যামাপ্রসাদের এই মৃত্যু এমন পরিবেশ সৃষ্টি করলো যে, নেহরু বাধ্য হয়ে কাশ্মীরের ইনার পারমিট ও পতাকা বাতিল করতে বাধ্য হলেন। সেদিন থেকে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলে ডাকাও চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। আজ যদি কাশ্মীর ভারতের অভিন্ন অঙ্গ হিসেবে জগতের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তা একমাত্র শ্যামাপ্রসাদের কারণেই।

শ্যামাপ্রসাদ যেদিন হিন্দু মহাসভার সভাপতি হয়েছিলেন সেদিন মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, 'মদনমোহন মালব্যের পরে দেশের হিন্দুদের শ্রদ্ধা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছাড়া আর কেউই অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না। শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া আর কারোর মধ্যে হিন্দুদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।' দেশের সমস্যার বিরুদ্ধে 'জটায়ু'র মতো লড়াই করার মানসিকতা শ্যামাপ্রসাদকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। রামায়ণের জটায়ু যেমন জানতেন মহাবলশালী বারণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অন্তিম পরিণতি কী। কিন্তু তা বলে কর্তব্য থেকে পিছিয়ে গেলে তো সীতা উদ্ধার হবে না। সেই রকম শ্যামাপ্রসাদও জানতেন ১৯৫২ সালে জনসঙ্ঘের যা ক্ষমতা তাতে তাঁর আন্দোলন কাশ্মীরকে হয়তো মুক্ত করতে পারবে না, কিন্তু তবু নিজের শক্তি সামর্থ্য মতো এর প্রতিবাদ করা দরকার। তাঁর অদম্য সাহসেই শেষপর্যন্ত নেহরু- আবদুল্লা পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ সেদিন দেশভক্তির যে বীজ পুঁতেছিলেন তা আজ বটবৃক্ষ হয়ে সারা দেশে জাতীয়তাবোধের স্নিগ্ধ ছায়া প্রদান করছে। আজ স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরে দেখা যাচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের অন্য সব ধারাকে ছাপিয়ে শ্যামাপ্রসাদের আদর্শ ও সাধনা জয়যুক্ত হয়েছে। নেহরু-গান্ধী ঐতিহ্যের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে শ্যামাপ্রসাদের মতাদর্শ। □

ঘাসফুল আঁকা ঝুলিতে হিন্দু ভোটে টান, তাই দিঘায় জগন্নাথ মন্দির

‘হিন্দু ভোটের মাত্র পাঁচ শতাংশও যদি তৃণমূল থেকে বিজেপির দিকে সরে যায়, তাহলে সেটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপর্যয়ের কারণ হবে।’

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

প্রতি ৫ জন হিন্দুর মধ্যে একজন ভোট দেন তৃণমূলকে! তার পরেও পশ্চিমবঙ্গে টানা ১৪ বছর গদি আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসুন, জেনে নেওয়া যাক কোন মন্ত্রবলে এভাবে বছরের পর বছর ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল।

দীর্ঘ বাম শাসনের অবসানে এ রাজ্যের ক্ষমতায় আসে তৃণমূল দল। মুখ্যমন্ত্রী হন দলের সর্বময় কর্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর শাসনকালে এ রাজ্যে হিন্দুরা যে বৈষম্য ও দমনমূলক আচরণের শিকার হয়েছেন বা হচ্ছেন, তা অস্বীকার করার কোনো আর উপায় নেই। বাংলাদেশের মতো এ রাজ্যেও মুসলমানদের হাতে হিন্দু সমাজ বিভিন্ন জায়গায় হামলার শিকার হয়ে চলেছে। হিন্দুদের উৎসব অনুষ্ঠান পালনে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মুসলমান তোষণের কারণে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে তৃণমূল পরিচালিত সরকার। অনেক এলাকায় হিন্দুরা কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছেন।

তার পরেও এ রাজ্যের একটা বড়ো অংশের হিন্দুভোটার ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ইভিএমে ঘাসফুল আঁকা বোতামে চাপ দেন। যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং হিন্দুদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড়, সেখানেও হিন্দুদের একটা অংশ ভোট দেয় তৃণমূল দলকে। এর কারণ কী? এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে গত লোকসভা নির্বাচনের ফল।

পশ্চিমবঙ্গে ৭.৬৩ কোটি ভোটারের মধ্যে হিন্দুপ্রায় ৫.১৯ কোটি। শতাংশের হিসেবে প্রায় ৬৮ শতাংশ। রাজ্যে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হন প্রায় ৮০ শতাংশ ভোটার এর মধ্যে হিন্দু ভোটার ৬৫ শতাংশের কাছাকাছি। অথচ মুসলমান ভোটাররা মহল্লা উজাড় করে হাজির হয় ভোটকেন্দ্রে। তাদের উপস্থিতি ৯০ থেকে ৯৪ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ৩.৩৭ কোটি হিন্দু ভোটার ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এঁদের এক-পঞ্চমাংশেরও কম ভোটার তৃণমূলকে ভোট দেন। অন্তত পরিসংখ্যান সেকথাই বলছে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথাই ধরা যাক। ওই ভোটের ফল থেকে জানা গিয়েছে, এ রাজ্যে বিজেপি প্রায় ২.৩৩ কোটি ভোট পেয়েছে। শতাংশের হিসেবে ৩৮.৭৩। এই ভোটাররা যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা প্রায় সবাই যে হিন্দু, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুসলমানরা যে বিজেপিকে ভোট দেয়নি, তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এর অর্থ হলো, হিন্দুদের প্রায় ৬৯ শতাংশ (৩.৩৭ কোটির মধ্যে ২.৩৩ কোটি) ছাপ দিয়েছেন পদ্মফুলে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কংগ্রেস ও বাম জোটের ঝুলিতে যে ৬৬.৪৫ লক্ষ ভোট পড়েছে, তার প্রায় ৭০ শতাংশই হিন্দুদের। অর্থাৎ প্রায় ৪৬.৫১ লক্ষ হিন্দু (যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ১৩.৭৭ শতাংশ) কংগ্রেস ও বামপন্থী জোটকে ভোট দিয়েছেন।

এভাবে প্রায় ২.৭৯ কোটি হিন্দু (যাঁরা ভোট দিয়েছেন) তাঁদের ৮২.৭৭ শতাংশ হয় বিজেপি নয়তো কংগ্রেস-বাম জোটকে সমর্থন করেছেন। এর মানে হলো, মাত্র ৫৭.৮৭ লক্ষ হিন্দু (যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের ১৭.২৩ শতাংশ) তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন।

প্রশ্ন হলো, তার পরেও কীভাবে তৃণমূল জয়ী হয়? কীভাবেই-বা পর পর তিনটি মেয়াদে সরকার গড়েছে ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং-এর দল? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে তোষণের রাজনীতি নামক চাবিকাঠিতে। কংগ্রেসের ডিএনএ থেকে জন্মানো তৃণমূল জন্মলগ্ন থেকে হাতিয়ার করেছে তুষ্টীকরণের রাজনীতিকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খয়রাতির মেঠো রাজনীতি। এই জোড়া কৌশলে তৃণমূলের জয় হয়েছে নিছকই কেকওয়াক। তৃণমূলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো মুসলমান ভোটার। এ রাজ্যের মুসলমানদের প্রায় সবাই ছাপ দেয় ঘাসফুলে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ভোটকেন্দ্রে আসা মুসলমান ভোটারদের প্রায় ৯৩ শতাংশই ভোট দেয় মমতার দলকে।

গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল হিন্দু সমাজের প্রায় ৫৮ লক্ষ ভোট পেয়েছিল। প্রশ্ন হলো, এই ৫৮ লক্ষ হিন্দু ভোটার কেন এমন একটি দলকে সমর্থন করল, যার সরকার হিন্দুদের প্রতি নিরাসক্ত এবং হিন্দুদের উদ্বেগের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে? এই ভোটাররা কারা? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হিন্দু সমাজের যে অংশ তৃণমূল ভোট দেয়, তাদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, প্রান্তিক এলাকার লোভী মানুষ এবং দুই, শহুরে স্বার্থান্বেষী।

যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে উন্নয়নের জয়ঢাক পেটায়, তবে আদতে রাজ্যটির সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের ছাপ স্পষ্ট। রোজগারের উপায় খুবই সীমিত। কৃষি আয়ের হ্রাস এবং শিল্প ও পরিষেবা

খাতে চাকরির অভাবে এই ক্ষেত্র ক্রমেই আরও সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

গ্রাম ও শহরতলি অঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র জনগণকে পেটের টানে পাড়ি দিতে হচ্ছে ভিন রাজ্যে। অথবা রাজ্যেই কোনোক্রমে টিকে থাকতে নিত্য লড়াই করে চলেছেন তাঁরা। সমাজবিজ্ঞানী অমিয় বসু বলেন, 'চা বা পকোড়া বিক্রির দোকান বসানো, রিকশা বা অটোরিকশা চালানো, বাজারে ছোটো জায়গা নিয়ে মাছের দোকান চালানো, ছোটোখাটো কন্ট্রাক্ট পাওয়া— এরকম কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছে এ রাজ্যে একমাত্র জীবিকার উপায়, যা কেবলমাত্র 'দিন আনা দিন খাওয়া'র মতো অবস্থা তৈরি করে। আর এসবের জন্য দরিদ্র জনগণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল স্থানীয় তৃণমূল নেতার দয়ার ওপর।' অর্থনীতিবিদ কৌশিক ব্যানার্জির বক্তব্যও মোটামুটি এক। তিনি বলেন, 'আমি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে বলি 'চিল্লার অর্থনীতি'। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ এবং শহরের একটা বড়ো অংশ সামান্যই আয় করেন ছোটোখাটো ব্যবসা করে কিংবা রিকশা টেনে। রাস্তার ধারে বেআইনিভাবে দোকান বসানো, রিকশা চালানো কিংবা ক্ষুদ্র সরবরাহকারী হওয়ার অনুমতি দেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা। তাই এই নেতাকে খুশি রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই দরিদ্রদের একটা বড়ো অংশ তৃণমূলকে ভোট দেয়।' কৌশিক বলেন, 'এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ছোটো অথচ প্রভাবশালী অনুদানগুলোর প্রভাব— যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বিধবা ভাতা ইত্যাদি। মহিলাদের ও বিধবাদের অ্যাকাউন্টে যে ১,০০০-১,২০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয় বা ছাত্রীদের বছরে দেওয়া ১,০০০ টাকা— এই অঙ্কগুলো হয়তো ছোটো মনে হতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো দরিদ্র একটি রাজ্যে এই টাকাগুলো গরিব মানুষের জীবনে বিরাট একটা ভরসার জায়গা। ফলে তাঁরা বাধ্য হন তৃণমূলকে ভোট দিতে।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষক কুণাল সেনগুপ্ত বলেন, 'রাজ্যের গ্রামীণ ও আধা-শহর এলাকায় স্থানীয় তৃণমূল নেতার কথাই শেষ কথা। স্থানীয় তৃণমূল নেতা মানুষকে ঘাসফুলে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেন। অনেকেই নীরবে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে গোপনে সেই নির্দেশ মানেন না, কিন্তু দুর্বলচিত্তের বহু মানুষ সেই সাহস দেখাতে পারেন না। বিশেষ করে সেইসব বুথে, যেখানে তৃণমূলের এজেন্টরা রাজ্য সরকারের কর্মচারী (যেমন ভোটকর্মী)-দের সঙ্গে মিলে ইভিএমের ওপর কঠোর নজরদারি চালান। তার ওপরে তো রয়েছে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ, যা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্তা দেবাংশু ঘোষ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের বুথের ভেতরে যেভাবে গোপনে কারচুপি হয়, তা কল্পনাতীত।'

শহুরে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত বাঙ্গালি হিন্দু, যাঁদের সাধারণত 'ভদ্রলোক' বলা হয়, তাঁরা এক দশক আগেও বামফ্রন্টকে ভোট দিতেন হাত উপুড় করে। বাম জমানার অবসানের পর তাঁরাই এখন ঝুঁকেছেন বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্ড কোং দলের দিকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক দেবপ্রতিম রায় বলেন, 'স্বার্থান্বেষী ভদ্রলোকরা নিজেদের বিজেপির বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধশক্তি হিসেবে ভাবেন। তিনি আদর্শগতভাবে বামফ্রন্টকে ভোট দিতে চাইতেন। কিন্তু জানেন বাম এখন খুবই দুর্বল এবং অপ্রাসঙ্গিক একটি দল। তাই বামেদের ভোট দিয়ে তিনি তাঁর মূল্যবান ভোট নষ্ট করতে চান না। সেই কারণেই তিনি ভোট দেন তৃণমূলকে।' তিনি বলেন, 'বেশিরভাগ শহুরে, মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত বাঙ্গালি হিন্দু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূলের অন্যান্য নেতাকে পছন্দ করেন না, তাঁদের বিশেষ সম্মানও করেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তৃণলমূলকে ভোট দেন। কারণ বিজেপিকে তাঁরা তৃণমূলের চেয়েও বেশি অপছন্দ করেন।' সমাজতাত্ত্বিক অমিয় বসু বলেন, ''অ-বাংলাভাষী হিন্দুরা মূলত ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষ। তাঁরা ব্যবসা করেন, দোকান চালান, শিল্প ইউনিট পরিচালনা করেন, কিংবা ঠিকাদার বা নির্মাণকার্যের সঙ্গে যুক্ত। শাসক দলের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁদের ব্যবসার সাফল্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। তাই তাঁরা তৃণমূলকে ভোট দেন। সেটা তৃণমূলের প্রতি ভালোবাসা থেকে নয় বরং টাকার প্রতি ভালোবাসা থেকে। যদি বিজেপি একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে উঠে আসতে পারে, তাহলে তাঁরা নির্দ্বিধায় বিজেপিকেও ভোট দিতে প্রস্তুত থাকবেন।''

হিন্দু ভোটের বাক্সে যে ধস নেমেছে, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কুণাল বলেন, 'হিন্দু ভোটের মাত্র পাঁচ শতাংশও যদি তৃণমূল থেকে বিজেপির দিকে সরে যায়, তাহলে সেটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপর্যয়ের কারণ হবে। তাই তিনি এখন হিন্দুদের মন পাওয়ার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন।' ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দীঘায় সরকারি কোষাগার থেকে ২৫০ কোটি টাকা খরচ করে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ হিন্দু ভোট ধরে রাখারই কৌশল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সমাজতত্ত্ববিদ কল্লোল কান্তি ভট্টাচার্য বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোভাবেই জানেন যে, অনেক হিন্দুই মুসলমানদের আক্রমণে ক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত। বিশেষ করে গ্রামীণ এবং আধা-শহর অঞ্চলের হিন্দুরা মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক ও জেহাদি আচরণে উদ্বিগ্ন। জেহাদি মুসলমান উত্থান হিন্দুদের মধ্যে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' তিনি বলেন, 'তা সত্ত্বেও মমতা ব্যানার্জি তাঁর মুসলমান তোষণের নীতিগুলো ত্যাগ করতে পারছেন না। কারণ তাঁর নির্বাচনী সাফল্যের জন্য মুসলমান ভোটব্যাংকের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি এখন হিন্দুদেরও দলে টানার চেষ্টা করছেন। এটি হিন্দুদের প্রতি একটি বার্তা যে তিনি আইনের শাসন কার্যকর করবেন। একই সঙ্গে তিনি মুসলমানদেরও একটি কড়া বার্তা দিয়েছেন যে, আইন লঙ্ঘন কোনোভাবেই রেয়াত করা হবে না।'

এখন দেখার, তৃণমূল নেত্রীর এই চালে কিস্তিমাত হয় কী না। □

> **“মমতা ব্যানার্জি তাঁর মুসলমান তোষণের নীতিগুলো ত্যাগ করতে পারছেন না। কারণ তাঁর নির্বাচনী সাফল্যের জন্য মুসলমান ভোটব্যাংকের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা সত্ত্বেও তিনি এখন হিন্দুদেরও দলে টানার চেষ্টা করছেন।”**

পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ

গোপাল চক্রবর্তী

দেশভাগের বীভৎস স্মৃতি নিয়ে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরা দিন কাটাচ্ছিল আতঙ্ক আর ত্রাসের মধ্য দিয়ে। অনেকে পিতৃপুরুষের ভিটে, সাজানো সংসার, নিশ্চিত উপার্জন সব কিছু ছেড়ে শুধুমাত্র ধর্ম আর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য পাড়ি দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ, অসম কিংবা ত্রিপুরায় অনিশ্চিত আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। আবার অনেকেই জন্মভূমির মায়া কাটাতে না পেরে মাটি কামড়ে পড়ে ছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। ভাবটা এমন, যেন এই যুদ্ধের সমস্ত দায় পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের। পঁয়ষট্টির পর থেকে শুরু হয় পাক সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং জনআন্দোলন। ফলে সরকার ও মোল্লাবাদী সংগঠনগুলি কিছুটা কোণঠাসা হয়। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে সামরিক শাসক আয়ুব খানকে গদিচ্যুত করে শুরু হয় আরেক সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের শাসন। অভূতপূর্ব রাজনৈতিক চাপে হলো ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন। আর এই নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তানে প্রায় সবকটি আসনে জয়ী হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামি লিগ, সমগ্র পাকিস্তানের সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দ্বিতীয় দল হয় জুলফিকার আলি ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি। স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে আওয়ামি লিগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করার কথা। কিন্তু শুরু হয় ইয়াহিয়া খানের ষড়যন্ত্র, একজন বাঙ্গালি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবে, এ পাকিস্তানের অপমান।

আবার পূর্বপাকিস্তানের প্রায় সব হিন্দুই আওয়ামি লিগের সমর্থক। আওয়ামি লিগের নেতারা আকারে প্রকারে বলছে ক্ষমতায় এলে তারা ভারতের সঙ্গে বন্ধ সীমান্ত খুলে দেবে, ভারতের সঙ্গে যাতায়াত এবং ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করবে। ওদিকে ভুট্টোও প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভে লালায়িত। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় সারা পূর্বপাকিস্তানের বাঙ্গালি জনতা তখন ফুঁসছে, ক্ষুব্ধ সর্বস্তরের মানুষ। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সাধারণ নির্বাচন হয়, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি কেটে যায় কিন্তু ইয়াহিয়া খান অনড়। ৭ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দান থেকে ঐতিহাসিক ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন বন্ধ হয়ে যায়। অফিস আলাদলতে বাঙ্গালি কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাঙ্গালিদের সমুচিত শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হয়। করাচি বন্দর থেকে যুদ্ধ জাহাজ 'বাবর'কে নিয়ে আসা হলো চট্টগ্রাম বন্দরে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলি আর আপামর বাঙ্গালি জনগণের উপর। শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিমানে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের গোপন কারাগারে।

এদিকে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও সীমান্তরক্ষী ইপি আর যৌথভাবে ব্যারাক ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের বালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জি ও সি মেজর জিয়াউর রহমানকে দিয়ে আওয়ামি লিগের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করায়। শুরু হয় পাকবাহিনী এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর আর আওয়ামি লিগের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচণ্ড লড়াই। বাঙ্গালি জনতার মনে ত্রাসের সৃষ্টির জন্য 'বাবর' যুদ্ধ জাহাজ থেকে অনবরত গোলাবর্ষণ হতে থাকে। প্রথম দিকে বাঙ্গালি স্বাধীনতাকামীরা প্রতিরোধ করতে পারলেও ক্রমে তা ভেঙে পড়ে। পাকবাহিনী বোমাবর্ষণ করে বাঙ্গালিদের ঘাঁটিগুলি ভেঙে দিয়ে প্রথমে শহরগুলি দখল করে। এই সময়ে পাকিস্তানি বাহিনী বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করতে থাকে, মুসলমানরা বহাল তবিয়তে থাকে। হিন্দুরা দলে দলে শহর ছেড়ে গ্রামে পালাতে থাকে। গ্রামগুলিতে তখনো বাঙ্গালি বাহিনীর আধিপত্য ছিল। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে পাকবাহিনী মফস্সল শহরগুলিতে ঘাঁটি করে এবং গ্রামগুলির উপর আক্রমণ চালায়। তাদের লক্ষ্য ছিল হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলি। বেছে বেছে হিন্দু বাড়িগুলিতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, গণহত্যা, নারীধর্ষণ চলতে থাকে। এই সময়ে মুসলমানদের একাংশ পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মিশে হিন্দু নিধনে মেতে ওঠে। তাদের মধ্যে মুসলিম লিগ, জামাতে ইসলামির সমর্থকরা যেমন আছে, তেমনই আছে যারা কদিন আগেও শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামি লিগের সমর্থক ছিল। এইসব পাকিস্তান-পন্থীদের নিয়ে তৈরি হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী আলবদর, রাজাকার, আল শামস প্রভৃতি বাহিনী।

নারকীয় হত্যালীলা, হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ, লুণ্ঠনে তারা নজির তৈরি করেছিল। হিন্দুরা তখন আত্মগোপন করে থাকে নিরাপদ অঞ্চলে। যদি কোনো কারণে কোনো হিন্দু পাকবাহিনী বা তাদের সহযোগীদের হাতে পড়ে, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। ট্রেন, বাস, নৌকা থেকে যাত্রীদের নামিয়ে বেছে বেছে হিন্দুদের গুলি করে মারা হয়। হিন্দু সন্দেহ হলে তাকে ঘাতকরা কলেমা পড়তে বলত, হিন্দুরা কলেমা জানে না, তাই ধরা পড়ে যেত। অনেক হিন্দু ভয়ে এই সময়ে কলেমা শিখে নিয়েছিল, অবিশ্বাস হলে তাদের কাপড় খুলে পুরুষাঙ্গ পরীক্ষা করে দেখা হতো সুন্নতের চিহ্ন আছে কিনা। হিন্দুরা তখন গোপনে দলে দলে ভারতের পথে। জীবন ও বিষয় সম্পত্তির রক্ষার জন্য অনেক হিন্দু তখন মুসলমানও হয়েছিল। অসংখ্য হিন্দু মেয়ে নির্যাতিতা হয়ে কিংবা নির্যাতিতা হবার ভয়ে আত্মহত্যা করেছে।

মুক্তিযুদ্ধে যে ত্রিশ লক্ষ নিহত হয় তার অর্ধেকেরও বেশি ছিল হিন্দু। যারা কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা সর্বস্ব হারিয়েছিল। দীর্ঘ ন'মাস মরণপণ সংগ্রামের শেষদিকে ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ভারত স্বীকৃতি দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রকাশ্যে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। ভারতীয় বাহিনীর মদতপুষ্ট মুক্তিবাহিনী দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পায়। বিপর্যস্ত হয় পাকিস্তানি বাহিনী। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বিকেলে পাকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল নিয়াজি তিরানব্বই হাজার সৈন্য-সহ ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সর্বাধিনায়ক জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুরা আশার আলো দেখেছিল, পাকিস্তানি জমানার অবসান হয়েছে, বাংলাদেশে এবার সংখ্যালঘু হিন্দুরাও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুসলমানদের সমান মর্যাদা পাবে। ধর্ম-কর্ম পালনে কোনো বাধা থাকবে না। নারীদের সম্ভ্রম রক্ষিত হবে, সম্পত্তি, ব্যবসাবাণিজ্য থাকবে সুরক্ষিত। দীর্ঘ কারাবাসের পর মূলত আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তানের জেল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হলো। স্বাধীন বাংলাদেশে এসে আবেগে আপ্লুত শেখ মুজিবুর রহমান, ভারতের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বাংলাদেশে গেলেন ইন্দিরা গান্ধী। বিপুল সংবর্ধনা পেলেন। আবেগের আতিশয্যে দুই নেতা-নেত্রীর মধ্যে ১৯৭২ সালের এক অশুভ মুহূর্তে সম্পাদিত হলো 'ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি' যার প্রধান শর্ত ছিল ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পর বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে তাদের ভারত সরকার নাগরিকত্ব দেবে না, তাদের ফিরে যেতে হবে বাংলাদেশে। স্বাধীন বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিকেরা এনিয়ে সেদিন মাথা ঘামায়নি। যদি নিরাপত্তা এবং মান সম্মান নিয়ে মাতৃভূমিতে থাকা যায় তবে কেন তারা উদ্বাস্তু হতে যাবে? কিন্তু এই মোহভঙ্গ হতে বেশিদিন লাগল না।

১৯৭২ সালের অক্টোবরে দুর্গাপূজার অষ্টমীতে পরিকল্পিতভাবে সারা বাংলাদেশে একযোগে মণ্ডপে মণ্ডপে দুষ্কৃতীরা হানা দিয়ে মূর্তিগুলি ভেঙে দেয়। মুজিবুর রহমানের আরেকটি অদূরদর্শিতা, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদেরও বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। যেসব মুসলমান সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এবং পাকবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে দেশ স্বাধীন হবার পর কারারুদ্ধ হয়ে বিচারের অপেক্ষায় ছিল, তাদের এক সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে মুজিবুর মুক্তি দিয়ে দিলেন। যদিও তখন মুসলিম লিগ, জামায়াতে ইসলামের মতো মুসলমান জেহাদি দলগুলি নিষিদ্ধ, তাদের অনেকেই গিয়ে ঢুকল মওলানা ভাসানির ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টিতে। মওলানা ভাসানি তখন চরম ভারত বিরোধী। তাঁর ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিল অনেক ঘাতক। আর মুসলমান মহল্লায় মহল্লায় তখন প্রতিনিয়ত শুরু হয়ে গেল মিলাদুন্নবী, ইসলামি জলসার মতো অনুষ্ঠান, যাতে প্রকাশ্যে ভারত, হিন্দু, আওয়ামি লিগ আর মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হতে লাগল।

পরলোকে উত্তম কুমার মাহাতো

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক উত্তম কুমার মাহাতো গত ২৩ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি তাঁর মা-সহ ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন। উত্তমদা ১৯৮৯ সালে পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডিতে প্রচারক জীবন শুরু করেন। তার পরে ক্রমে পুরুলিয়া জেলা প্রচারক, বীরভূম জেলা প্রচারক, আন্দামান-নিকোবরে প্রচারক এবং মুর্শিদাবাদ জেলা ও বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। গত সাত বছর ধরে তিনি পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্ব পালন করছিলেন। গত ৩ দিন ধরে তিনি মস্তিষ্কের সংক্রমণের কারণে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। সেখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

এইসব অনুষ্ঠান অল্পদিনের মধ্যেই শেখ মুজিব এবং আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে এক প্রবল জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো, আর তাতে ইন্ধন জোগাল পাকপন্থী ব্যবসায়ীদের সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। অবশ্য কিছু কিছু আওয়ামি লিগ নেতা এবং কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধার স্বেচ্ছাচারিতা এবং অসামাজিক কাজকর্মেও মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, সেনাবাহিনীর মধ্যেও যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলেন। তারপর বাংলাদেশে পর পর শুরু হয় সামরিক শাসন। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান বিএনপি এবং সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি এদের সঙ্গে মিশে যায়। তাছাড়া মুসলিম লিগ, জামায়াতে ইসলামি এবং মধ্যপ্রাচ্যের অর্থানুকুল্যে পুষ্ট বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন তো ছিলই। এরা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ফেলে। □

পুনরাবৃত্তির পথে ইতিহাস

২০ জুনের শিক্ষা কি আজও প্রাসঙ্গিক?

বিপ্লব বিকাশ

গত ১৬ জুন তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য দেশজুড়ে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষাভাষীদের 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া চলছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশি হিসেবে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে শুধু তারা বাংলাভাষায় কথা বলছে সেই কারণে আপনারা প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন।' তিনি আরও বলেন, '....যাদের ভোটার আইডি, প্যান ও আধার কার্ড রয়েছে, সেই সব মানুষদের আপনাদের রাজ্যগুলোতে জীবিকা নির্বাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।'

এই মন্তব্য প্রথমে বাংলাভাষার প্রতি সংবেদনশীলতার প্রকাশ বলে মনে হলেও, আসলে এটি এক গভীর বিপদের দিকে ইঙ্গিত করছে। কারণ এই বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলমান অনুপ্রবেশ ও বেআইনিভাবে পরিচয়পত্র তৈরির একটি বড়ো চক্রান্তকে ঢাকার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে পরিচালিত বড়ো মাপের একটি নেটওয়ার্ক নানা অবৈধ কার্যকলাপে দীর্ঘদিন ধরেই লিপ্ত। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তারা বহুদিন ধরেই ভারতীয় নাগরিকত্বের জাল পরিচয়পত্র জোগাড় করে দিচ্ছে। জাল ভোটার আইডি, আধার, প্যান, রেশন কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও পাসপোর্ট তৈরি করে চলেছে এই চক্রটি। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে ভাষাগত পরিচয়ের আড়ালে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা শুধুই ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে দুর্বল করে না, বরং প্রকৃত হিন্দু বাঙ্গালি নাগরিকদেরও মর্যাদাহানি ঘটায়।

এই সংকট আজ নতুন নয়। দেশভাগের আগে ঠিক এইরকম অস্পষ্ট, আপোশমূলক ও স্বার্থান্বেষী নীতিই বঙ্গকে বিভাজনের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। যারা তখন রাজনৈতিক সুবিধার জন্য মুসলিম লিগের সঙ্গে গোপন সমঝোতা করেছিল, তারা স্বপ্ন দেখিয়েছিল একত্রিত, ধর্মনিরপেক্ষ বঙ্গের। কিন্তু বাস্তবে তারা বঙ্গের হিন্দুসমাজের সঙ্গে ছলনা করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের সেই ছলনা শেষপর্যন্ত হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তির ওপর জেহাদি আক্রমণ, গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ হিন্দু বাঙ্গালির উদ্বাস্তু জীবনের নির্মম বাস্তবতায় পর্যবসিত হয়। লক্ষ লক্ষ পরিবার তাঁদের ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি, বসতভিটে এবং তাঁদের শিকড় ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে রাতারাতি পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসে। যারা ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল, তারা কি বাংলা ভাষা বলত না? শুধু বাংলা বললেই কি প্রকৃত বাঙ্গালি হয়ে যাওয়া যায়? সেদিনের এই রাজনৈতিক প্রতারণা এবং ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের দ্বিচারিতা আজও ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা রয়েছে।

দুঃখজনকভাবে, আজকের পশ্চিমবঙ্গেও সেই পুরনো কার্যকলাপের ছায়া স্পষ্টভাবে প্রকট হচ্ছে। ভোটব্যাংকের রাজনীতি আজ এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়—সবকিছুই হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক লেন-দেনের পণ্য। নির্লজ্জভাবে অনুপ্রবেশকারীদের তোষণ, তাদের প্রশাসনিক মদত, রাজনৈতিক সুরক্ষা দানের মাধ্যমে এবং তথাকথিত মানবিকতার নামে দেশের নিরাপত্তা এবং সামাজিক ভারসাম্যকে চরমভাবে বিঘ্নিত করার কাজ চলছে।

এই প্রেক্ষাপটে ২০ জুন, ১৯৪৭-এর শিক্ষা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে এক গভীরতর অর্থ বহন করে। সেদিন ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ও দূরদর্শী নেতৃত্বে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের হাত থেকে হিন্দুবাঙ্গালিকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা আংশিকভাবে হলেও সফল হয়েছিল। তাঁর অকুণ্ঠ ঘোষণা 'যদি দেশভাগ হয়, তবে বঙ্গভাগ হোক'—শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল না, সেটি ছিল সংস্কৃতিগতভাবে বাঙ্গালি হিন্দুর আত্মরক্ষার লক্ষ্যে একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। ওই একটি ঘোষণায় কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারণ হয়নি, নির্ধারিত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ। কলকাতা পাকিস্তানে চলে যাওয়ার হাত থেকে সে যাত্রায় বেঁচে যায়। ভারতের অংশ হিসেবে তার আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখে বঙ্গপ্রদেশের এক খণ্ডিত অংশ— 'পশ্চিমবঙ্গ'।

দুঃখজনক বিষয় হলো, পশ্চিমবঙ্গে সেই ইতিহাস আজ অনেকেই ভুলে গিয়েছেন। ইতিহাস বই থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে ১৯৪৭ সালের ২০ জুনের ইতিহাসকে। নতুন প্রজন্ম জানেই না যে, একদিন পুরো বঙ্গপ্রদেশ পাকিস্তানের অধীনে চলে যেতে পারত, যদি না একটি নির্ভীক সিদ্ধান্ত সেই পরিস্থিতি পালটে ফেলত। সামাজিক চেতনা শূন্যতা এই রাজ্যে আজ এতটাই প্রকট যে, নিজেদের পূর্বপুরুষদের বাস্তুচ্যুতির কাহিনি যারা বয়ে বেড়াচ্ছে, তাঁরাও জানে না সেই যন্ত্রণার হাত থেকে তাঁদের বাঁচাতে কে এগিয়ে এসেছিলেন? একটি হিন্দু হোমল্যান্ড তৈরির মাধ্যমে তাঁদের অস্তিত্বরক্ষায় কে লড়েছিলেন? কে রুখেছিলেন সম্পূর্ণ বঙ্গপ্রদেশের পাকিস্তানভুক্তি? এখন সময় এসেছে জেগে ওঠার। সময় হয়েছে ইতিহাসকে স্মরণ করার, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং সম্মিলিতভাবে হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ রক্ষার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেওয়ার। আত্মপরিচয় রক্ষার সংগ্রাম এখন সবচেয়ে জরুরি। রাজনীতির স্বার্থে সত্য বিসর্জন নয়, বরং সাহসিকতা ও ঐতিহ্যের উপলব্ধির ভিত্তিতে সুস্থ সমাজ গঠন আজ আবশ্যক। ২০ জুন হিন্দু বাঙ্গালিকে শিখিয়েছে সঠিক নেতৃত্বের অধীনে, সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা পেতে পারে। □

একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ কম বয়স থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে সরকারি বৃত্তি-সহ প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন ১৯১৭ সালে। ১৯১৯ সালে আইএ পরীক্ষায় তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স-সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিএ পাশ করেন ১৯২১ সালে। আইএ এবং বিএ দুই পরীক্ষাতেই বাংলায়ও প্রথম হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য ও স্বর্ণ পদক পারিতোষিক লাভ করেন। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এমএ পাশ করেন ১৯২৩-এ।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বড়দা রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ দু'জনের উৎসাহে বাড়ি থেকে মাসিক 'বঙ্গবাণী' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। এই প্রত্রিকাতেই শ্যামাপ্রসাদ সাহস করে প্রথম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে বিএল পাশ করেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হন। ১৯২৬-এ তিনি বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়তে যান এবং সাফল্যের সঙ্গে ব্যারিস্টারি পাশ করে পরের বছরই ফিরে আসেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সারা ভারতে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভের ব্যবস্থা হয়। এই যুগান্তকারী বিধানকে স্বাগত না জানিয়ে শিক্ষিত সমাজের একাংশ বাংলাভাষায় এমএ পাশদের নিয়ে নানা রঙ্গব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ করতে থাকে পত্রপত্রিকায়। নিজ মাতৃভাষার গৌরবে গৌরাবান্বিত না হয়ে তাকে হেয় করার মনোবৃত্তিতে আশুতোষ দুঃখিত হলেন, কিন্তু দমলেন না। বাংলা বিষয়ের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁর মধ্যমপুত্র ইংরেজি ভাষায় বিএ অনার্সে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী শ্যামাপ্রসাদকে বাংলা এমএ ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়' নীতি পুরোপুরি মেনে চলতেন। বর্তমান নিকট অতীতের কিছু রাজনৈতিক নেতা যেমন 'ইংরেজি হঠাও' বলে নিজ পুত্র-পৌত্রকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে প্রেরণ করতেন— সেরকম কাজ আশুতোষ করেননি। পারিবারিক ঐতিহ্য শিক্ষা ও আইন ব্যবসা ছেড়ে কেন রাজনীতিতে এলেন— পরবর্তীকালে একথা কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে শ্যামাপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বলতেন— 'কী করব বল— বাবা আমার ভাত মেরে গেছেন। তাঁর আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে বাংলায় এমএ পাশ করেছি। কিন্তু বাংলায় এমএ-কে চাকরি দেবে কে? তাই তো রাজনীতিতে এসেছি অন্ন সংস্থানের আশায়।' বলেই উচ্চরোলে হাসি।

শ্যামাপ্রসাদ ১৯২৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। এই বছরই মে মাসে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর সিন্ডিকেটের শূন্য আসনে সদস্যরূপে মনোনীত হন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ার সময় তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে) প্রায় দশ বছর পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টানা চার বছর তিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পিতা আশুতোষের শিক্ষা সংক্রান্ত আদর্শ ও লক্ষ্যগুলি কাজে পরিণত করতে শুরু করেন। বিজ্ঞানসাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্যামাপ্রসাদের কাছে লেখা এক পত্রে বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কাজে তুমি দেখিতেছি 'বাপকা বেটা' হইয়াছ। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে রাজি নয়।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দান করার জন্য অনুরোধ জানান। এই সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ প্রথা ভঙ্গ করে বাংলায় তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দেন। উচ্চশিক্ষা প্রসারে শ্যামাপ্রসাদ মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তাঁর নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সদস্য ও পরে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ভাষণ দেওয়ার জন্য ও কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ আসতে থাকে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে শ্যামাপ্রসাদ ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সের কোর্ট ও কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইন্টেলেকচুয়াল

ফঃ ৩

কো-অপারেশন কমিটিতে ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত হন।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ লিখেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদের অন্যতম কৃতিত্ব হলো— ১. কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা, ২. বিহারীলাল মিত্রের অর্থানুকূল্যে মেয়েদের জন্য হোম সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা ও হোম সায়েন্স শিক্ষার ব্যবস্থা, ৩. আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা এবং ৪. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সামনে রেখে বাংলা বানানের সমতা এবং বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন। শেষোক্ত লক্ষ্যে দুটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-রেজিস্ট্রার ড. দীনেশচন্দ্র সিংহের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি হলো— বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন, বাংলা বানান সংস্কার, বাংলা পরিভাষা সমিতি গঠন, রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষায় সমাবর্তন ভাষণদানে আহ্বান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নের পরিবর্তন ইত্যাদি।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধিক পরিমাণে যুক্ত করার। আশুতোষের অনুরোধে কবি ইতিপূর্বে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে বাংলার প্রশ্নপত্র রচনা করেছিলেন। কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশের পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে সাম্মানিক ডক্টর অব লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজির পরিবর্তে বাংলায় ভাষণ দিতে গিয়ে সেই কথা স্মরণ করে বলেন— 'বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটি গ্রন্থি একসঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ঋতু পরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় শীতে আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নবপল্লব উৎসব।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-রেজিস্ট্রার ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর শ্যামাপ্রসাদ : বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৫১) লিখেছেন, 'মুসলমান ছাত্ররা সেই সমাবর্তন বয়কট করে কবির প্রতি অসৌজন্য প্রকাশেও পিছপা হয়নি।'

কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্যামাপ্রসাদ যে সুচিন্তিত ও মূল্যবান বক্তৃতাগুলি দেন তা থেকেই তাঁর শিক্ষানীতি সম্পর্কে বোঝা যায়। তিনি সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। উচ্চশিক্ষা ছাড়া যে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ সম্ভব নয়— এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। জাতীয় উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে— এ কথা তিনি বহু বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। ছাত্রদের নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনের কথা শ্যামাপ্রসাদ বলেন ১৯৩৫-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে— ''আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা যদি দৈহিক শক্তিতে দুর্বল হয় এবং আধুনিক জীবনের আনুষঙ্গিক চাপ সহ্য করিতে অশক্ত ও তাহার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম করিতে অসমর্থ হয়, তো শিক্ষার কি মূল্য থাকিতে পারে? আমরা যাহাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতেছি তাহাদের জন্য সুস্থ ও সবল করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারি তাহা হইলে এই শিক্ষাদান ব্যর্থ হইয়া যাইবে। শুধু শারীরিক উন্নতি অথবা অভাবী ধী-সম্পন্ন ছাত্রদের সাহায্য করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র যাতে উন্নত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এমন একদম নর-নারী সৃষ্টি করিতে হইবে যাহারা গৃহের, গ্রামের ও শহরের এমনকী সরকার, স্থানীয় শাসন ও জাতীয় পরিকল্পনার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে— যাহারা ন্যায়পথ অনুসরণ করিয়া ভয়শূন্য চিত্তে জনকল্যাণ মহাব্রতের উৎযাপনের জন্য কাজ করিয়া যাইবে।''

উচ্চশিক্ষা ছাড়াও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথাও তিনি বলেছিলেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি বলেন— 'একথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। যেখানে এই শিক্ষা বিনা বেতনে বিতরণ করা হয় সেই সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরিণতি হিসেবে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারলে ওই শিক্ষা যে শুধু ব্যর্থ হয় তাই-ই নয়, তা রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।'

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন যে, ভারতের দেশীয় ভাষাগুলিকে উন্নত করতে হবে এবং জাতীয় শিক্ষানীতিতে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। ১৯৪৩-এ গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে তিনি বলেন, 'পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের সিংহদ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত করা হয়েছে বলে আমাদের দুঃখ নেই। পরিতাপের বিষয় এই যে, এর জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বলি দেওয়া হয়েছে।'

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার চিহ্ন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নটি পরিবর্তন করার ব্যাপারে বেশ কিছুকাল ধরেই আলাপ-আলোচনা চলছিল। অনেক কমিটি, মিটিং, বৈঠক ও বিশেষজ্ঞদের মতামত জানার পর প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ওপর বাংলায় 'শ্রী' অক্ষর শোভিত প্রতীক চিহ্নটি গৃহীত ও প্রচলিত হয়। ১৯৩৭-এ অখণ্ড বঙ্গে মুসলিম লিগের সরকার গঠিত হয়। তারা এই 'শ্রী' ও 'পদ্ম'-কে ইসলাম-বিরোধী বলে অভিহিত করে। ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন থেকে শ্রী ও পদ্ম সরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৮-এর আগস্ট মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপাচার্য পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিগ সাফল্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় চালানো সত্ত্বেও তাঁকেই পুনর্নিয়োগ না করে শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক মুসলমান উপাচার্য নিয়োগ করে। ফলে প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থারও ইসলামীকরণ শুরু হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন আদ্যন্ত শিক্ষাবিদও অনুভব করেন যে বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব সংকটে এবং মূলত বাঙ্গালি হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে অস্তিত্বরক্ষার জন্যই তিনি রাজনীতিতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন।

(লেখক ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

এরাজ্যে সংখ্যালঘু মেয়েরা কি নিরাপদ ?

শবরী ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে ভারতের সবচেয়ে বড়ো মুসলমানদরদি হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির সময়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রয়াস চালিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে মুসলমানদের উন্নয়ন করার জন্য কী কী প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, তা-ও এ রাজ্যের অধিবাসীদের সামনে তুলে ধরছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠছে যে, এ রাজ্যে প্রকৃতপক্ষেই মুসলমানরা ভালো আছেন কি?

গভীর পরিতাপের বিষয় হলো যে, পশ্চিমবঙ্গে মেয়েরা আজ মোটেও সুরক্ষিত নয়। মুসলমান নারীরাই-বা কেন বাদ যাবেন? পার্কস্ট্রিটের সুজেটের কথা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে। তৃণমূলের নেতা, নেত্রীরা, এমনকী স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত ওই ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সুজেটের চরিত্র নিয়ে কদর্য প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূলের অনেকেই। প্রধান অপরাধী কাদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। সে সময়ে অপরাধীকে ধরতে কলকাতা পুলিশের 'ধীরে চলো' নীতি ঘোর সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে, কাদেরের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো তৃণমূল নেতা মহম্মদ সোহরাবের কুখ্যাত পুত্র যে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে রেড রোডে বায়ুসেনার এক জওয়ানকে পিষে মেরেছে। কাদেরকে দেশছাড়া হতেও সে

সাহায্য করেছিল। সুজেট আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর বিদেহী আত্মা কি জানতে পারবে কোনোদিন যে, ওই পাপিষ্ঠ কাদের তার কৃতকর্মের উপযুক্ত দণ্ড পেয়েছে?

রাণাঘাট কাণ্ডের জেরে ভারতের মুখ পুড়েছে। বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে উঠেছে সমালোচনার ঢেউ। তখন মুখ্যমন্ত্রী আলটপকা মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন, বিজেপি এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। পরে যখন ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশি ডাকাতের যোগ আছে বলে জানা গেল তখন তিনি একটি বারের জন্যও ক্ষমা চাইলেন না তাঁর মন্তব্যের জন্য। যখন জানা গেল প্রধান অপরাধী একজন বাংলাদেশি মুসলমান তখন মা-মাটি-মানুষের সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বললেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন। খ্রিস্টানরাও কি সংখ্যালঘু নন? অথবা মমতা শুধু ভোটব্যাংক নিয়ে কারবার করেন বলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের চেয়ে অনেক কম সংখ্যায় বসবাসকারী খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর চিন্তা নেই?

মুখ্যমন্ত্রী মুসলমান পরবে হিজাব পরেন, ফুরফুরা শরিফে যান— এসব দেখে যে সব মুসলমান তাঁকে ইসলামদরদি ভেবে ভোট দিচ্ছেন তাঁদের জানা উচিত, মুসলমান মেয়েরাও এ রাজ্যে নিরাপদে নেই। সবাই জানেন যে বেশ কয়েক বছর আগে জয়নগরে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক তরুণ একটি কলেজ ছাত্রীকে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। ঘটনাচক্রে উভয়েই মুসলমান। ছাত্রীটি গরিব ঘরের। দুঃস্থ বাবা-মা মেয়েটির চিকিৎসা পর্যন্ত ঠিক ভাবে করাতে পারেননি। দশ দিনের মধ্যে তৃণমূলের নেতারা পীড়িত মেয়েটি অথবা তার পরিবারের সঙ্গে একবারও দেখা করার সময় পাননি। মেয়েটি যখন দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারাতে বসেছে তখন সংবাদপত্রে প্রবল সমালোচনা দেখে মেয়েটিকে চিকিৎসার খরচ দেবার কথা তাঁদের মাথায় আসে। অথচ মেয়েটি এখন আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই। তৃণমূলের আগে সুবুদ্ধির উদয় হলে হয়তো তার চোখ দুটি বাঁচত। প্রশ্ন ওঠে, তৃণমূল তথা মমতার মুসলমানদরদ কি পুরোটাই কুম্ভীরাশ্রু অথবা অপরাধী ছেলেটি কোনো তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ?

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর চেয়ে তথাকথিত সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিয়ে আমাদের সহিষ্ণু ও 'সেকুলার' মুখ্যমন্ত্রী বড়োই ভাবিত। কিন্তু চিন্তার বিষয় একটাই। যেখানে মুসলমান দরদি দিদি তাঁর মুসলমান বোনদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেন না, সেখানে অন্য সংখ্যালঘু বোনদের নিরাপত্তা নিয়ে কে ভাববে? গুজরাট, মধ্যপ্রদেশে কিন্তু এমন হয় না। □

অটিজম রোগ নয়

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজর্ডার বা এএসডি কোনো অসুখ নয়, এটি মানসিক বিকাশজনিত সমস্যা। এর সম্বন্ধে অনেকেরই কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই। তাই সচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছর ২ এপ্রিল পালিত হয় বিশ্ব অটিজম দিবস।

অটিজম কোনো বংশগত রোগ নয়। একজন সুস্থ মা-ও অটিস্টিক শিশুর জন্ম দিতে পারেন। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, মোৎসার্ট, বিল গেটস, স্টিভ জোবস-সহ অনেক সফল মানুষই অটিজম স্পেকট্রাম ডিজর্ডার নিয়েই বিশ্ব জয় করে ফেলেছেন। অটিজম আক্রান্ত শিশু বা ব্যক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে আলাদা হয়, ফলে তারা সুস্থ সামাজিক বিষয়গুলির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না বা আয়ত্ত করতে দেরি হয়। ২ এপ্রিল দিনটি পালনের উদ্দেশ্য অটিজম নিয়ে ধারণা স্পষ্ট করা।

অটিজম কী

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অটিস্টিক বলা হয়। শব্দটি অটিজম ল্যাটিন autisums শব্দ থেকে এসেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে যে সমস্ত মানুষ aut বা নিজেদের নিয়ে Ism বা মগ্ন থাকার প্রক্রিয়াকে অতিক্রম করতে পারেন না, তাদের এই অবস্থাকে অটিজম বলে। বাংলাভাষায় একে আত্মমগ্নতা, স্নায়ুবিকাশজনিত বা আচরণগত সমস্যা বলা যায়। অটিজমের লক্ষণ ধরা পড়ে শিশুর জন্মের দু-তিন বছরের মধ্যেই। শিশুর আচরণে ছোটো ছোটো পার্থক্যকে নিছক দুষ্টুমি বা জেদ বলে এড়িয়ে যাবেন না। বাবা-মায়ের সচেতন পদক্ষেপ অটিস্টিক শিশুকে জীবনের মূলস্রোতে ফেরাতে সক্ষম।

ইতিহাস

অটিস্টিক মানুষ অনেককাল আগে থেকেই পৃথিবীতে ছিল, কিন্তু তা আজকের মতো করে চিহ্নিতকরণ হয়নি। ১৯১১ সালে সুইম মনোচিকিৎসক ইউজেন ব্লিউলার তীব্র সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তদের চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রথম অটিজম শব্দের প্রয়োগ করেন। এরপর লিও ক্যানার নামক আমেরিকান মনোচিকিৎসক ১৯৪৩ সালে একটি গবেষণার মাধ্যমে অটিজমের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেন, যার নাম দেন ইনফেনটাইল অটিজম।

১৯৪৪ সালে অস্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী ডাঃ হান্স অ্যাসপাজার এ বিষয়ে যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণ করেন, তাঁর নাম অনুসারেই অটিজমের একটি শ্রেণীর নাম রাখা হয় আসপর্জার সিনড্রোম। যদিও অটিজম নিয়ে নানা গবেষনা চলছে এবং তাতে দেখা গেছে অটিজমের তীব্রতা ভীষণভাবেই বেড়ে চলেছে।

অটিজম বুঝবেন কীভাবে

- অটিস্টিক শিশু চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করে না। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চোখের সামনে আঙুল নাড়ালে দেখা যাবে সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।
- নিজের জগতে বিভোর থাকে। সামাজিক হতে পারে না। অপরিচিত জায়গা বা মানুষ পছন্দ করে না।
- অটিস্টিক বহু শিশু অত্যন্ত মেধাবী হয়, অনেক গুণের অধিকারীও হয়। আবার অনেকেই অমনোযোগী, অস্থির হয়ে থাকে।
- কথা বলা বা মনের ভাব প্রকাশে সমস্যা দেখা যায়। গুছিয়ে বাক্য গঠন করতে পারে না।
- কেউ হাসলে তার প্রত্যুত্তর দিতে পারে না।
- অন্যের বলা কথাকেই বলতে থাকে। যেমন, কেউ জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কী'। উত্তরে শিশুটিও বলবে 'তোমার নাম কী'। চিকিৎসার ভাষায় একে বলে ইকোলেলিয়া।
- বাড়ির একটা নির্দিষ্ট জায়গাকেই বেশি পছন্দ করবে। যে খেলনাটা তার পছন্দ হবে সেটা নিয়েই থাকতে পছন্দ করবে। বার বার একই কাজ করবে।
- খুব জোরালো আলো, উচ্চস্বরে কথা, জোর আওয়াজ সহ্য করতে পারে না। ভিড়, কোলাহল থেকে পালিয়ে যেতে চায়। জোরে হওয়া কোনো কিছুই অটিস্টিক শিশুর পছন্দ হয় না।
- হঠাৎ করে হেসে ওঠা, লাফিয়ে ওঠা, একা একা হাসা, ডাকলে সাড়া না দেওয়া।

অটিজম মানেই অক্ষমতা নয়

অভিভাবকদের একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, হতাশ হবার কিছু নেই, কারণ অটিজম মানেই অক্ষমতা নয়। বরং বিশেষজ্ঞদের মতে, অটিজম বেশ কিছু দিক দিয়ে শিশুকে এগিয়ে রাখে। তর মধ্যে অন্যতম হলো ভাবার ক্ষমতা। তার মৌলিকভাবে ভাবতে পারে।

চিকিৎসা নয় বিশেষ প্রশিক্ষণ

বর্তমানে দুই বা আড়াই বছরে শিশুদের স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। অটিজমের লক্ষণ থাকলে সেখানে শিক্ষক তা ধরতে পারেন। বাকি বাচ্চাদের থেকে আলাদা করতে পারেন। প্রতিটি শ্রেণীতেই কিছু ছাত্র থাকে যারা বাকিদের সঙ্গে পড়াশোনায় পেরে ওঠে না। তাদের মধ্যে অটিজমের লক্ষণ থাকতেই পারে। তাদের ফাঁকিবাজ ভেবে বকাবকি করার পরিবর্তে তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে অনেকেরই উন্নত স্মৃতিশক্তি, প্রখর দৃষ্টি এবং যেকোনো জটিল বিষয়কে সহজে বোঝার ক্ষমতা থাকে। সকলেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চায় তা নয়। কাউন্সেলিং করালেই অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়।

অটিস্টিক শিশুদের এক বিশেষ ধরনের যত্নের প্রয়োজন। 'স্পেশাল এডুকেশন' দরকার। কিছু থেরাপি রয়েছে, যেমন- অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ থেরাপি, স্পেশাল এডুকেটর লার্নিং থেরাপি। এগুলোর মাধ্যমেও অটিস্টিক শিশুকে স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ-স্মরণই এখন শ্রেষ্ঠ পথ

মোহিত রায়

২৩ জুন থেকে ৬ জুলাই— শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুদিন থেকে জন্মদিন— আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। শ্যামাপ্রসাদের বিভিন্ন কীর্তির কথা মাথায় রেখেও বলা যায় এই সময়ে শ্যামাপ্রসাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানোর সবচেয়ে সময়োপযোগী কাজ হবে তাঁর সৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বিপর্যয়ের বিষয়টি প্রচার করে জনমানসকে সচেতন করা ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবার প্রস্তুতি নেওয়া। শ্যামাপ্রসাদের মতন একজন কৃতী শিক্ষাবিদ রাজনীতিতে এসেছিলেন বঙ্গের মানুষকে ইসলামি অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। তিনি কোনো ধর্মীয় নেতা ছিলেন না। তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়ে চেয়েছিলেন বঙ্গের ইসলামীকরণ বন্ধ করতে। এমনকী ১৯৪৬-এর শেষ পর্যন্ত তিনি ভারত ভাগ ও বঙ্গ ভাগের বিপক্ষেই ছিলেন। কিন্তু যখন কলকাতার হিন্দুদের নরসংহার, নোয়াখালি হিন্দুহত্যা হলো তিনি বুঝলেন যে ইসলামি অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে হিন্দুদের আলাদা বাসভূমি চাই। তাই তিনি বলেছিলেন যদি ভারত ভাগ নাও হয়, তবু হিন্দুর অস্তিত্বের স্বার্থে বঙ্গকে ভাগ করতে হবে।

বাঙ্গালির অস্তিত্ব মানে বঙ্গে পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত একটি জাতির ধর্মীয় ও সংস্কৃতি চর্চার অধিকার। পশ্চিমবঙ্গ শুধু বঙ্গের পশ্চিম অংশ নয়, পশ্চিমবঙ্গ একটি ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি অমুসলমান বাঙ্গালিদের নিরাপদ অস্তিত্বের জন্য। অস্তিত্ব মানে হিন্দু বাঙ্গালিদের নির্ভয় জীবনযাপন, নারীদের নিরাপত্তা, বহুমাত্রিক সংস্কৃতিক চর্চা,— এই সবকিছুই আজ বিপন্ন। পশ্চিমবঙ্গের আবির্ভাবের কারণ ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গের ভাগ। বঙ্গের এই বিভাজন হিন্দু বাঙ্গালিই চেয়েছিল, মুসলমানরা চায়নি। কারণ অবিভক্ত বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা পুরো বঙ্গকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। বঙ্গে ৬০০ বছরের ইসলামি শাসনের ইতিহাস বাঙ্গালি ভোলেনি। মাঝে ২০০ বছর অনেকটা শান্তির পর ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট শুরু হওয়া কলকাতার বীভৎস হিন্দুহত্যা, তারপর নোয়াখালিতে হিন্দু গণহত্যার পর কেউ মুসলমান শাসিত বঙ্গে থাকার কথা ভাবতেই পারেননি। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয়

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

আইনসভা ভেঙে তৈরি হলো পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। দুই আইনসভাতেই অমুসলিম সদস্যরা বঙ্গভাগের পক্ষে ও পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন সুনিশ্চিত করেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০ জুনই পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়ে গেল। হিন্দু বাঙ্গালি তাঁর নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ স্থাপন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের দুটি প্রধান শর্ত—

(১) যথেষ্ট বেশি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও (২) একটি সুরক্ষিত বহুত্ববাদী সমাজ।

(১) যথেষ্ট বেশি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা :

১৯৫১ সালের ১৯ শতাংশ মুসলমান এখন ৩০ শতাংশের কাছাকাছি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শর্তকে ইতিমধ্যেই লঙ্ঘন করেছে। বি আর আম্বেদকর দেশভাগের অনেক আগে ১৯৪০ সালেই সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেছিলেন যে, ''সংখ্যালঘু বিনিময়ই নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান।' দেশভাগের সময় পঞ্জাবের মতো বঙ্গে লোক বিনিময় হলো না। ফলে ভারতীয় পঞ্জাবে মুসলমান জনসংখ্যা কমে হলো ২ শতাংশ। তা আর খুব একটা বাড়েনি। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলে (যে চুক্তির বিরোধিতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহরুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে ১৯৫০ সালেই পদত্যাগ করেন) পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানদের বেশিরভাগ পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এলেন। ১৯৭৮ থেকে শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশি মুসলমানদের অনুপ্রবেশ। ব্যাপক বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ ও উচ্চ জন্মহারে আর দশক দুয়েকের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের আর কোনো অর্থই থাকবে না।

জনসংখ্যার এই সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের ভবিষ্যৎ। অথচ এই বিষয়টি এখনো পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির আলোচনায় মুখ্য বিষয় হয়ে উঠলো না। রাজ্য নির্বাচনে জনসংখ্যার বিষয়টি নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল তাদের ইস্তাহারে আলোচনা করে না। অনুপ্রবেশ নিয়ে একটিমাত্র দল আলোচনা করেছে কিন্তু জনসংখ্যায় এর প্রভাব এবং পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের সঙ্কট আগে সেভাবে কখনো আলোচনায় আসেনি। সুখের বিষয়, বর্তমানে এখন এটি প্রধান বিষয় রূপে উঠে এসেছে।

(২) একটি সুরক্ষিত গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদী সমাজ :

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের দ্বিতীয় আবশ্যিক শর্ত বাঙ্গালির বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক সমাজ। ১৯৭৭-এ ক্ষমতায় এসে ৩৪ বছর ধরে ইসলামি মোল্লাবাদকে তোষণ করলেন সিপিআইএমের নেতৃত্বে সব ধরনের বামপন্থীরা। বামপন্থী সরকার সারা রাজ্যে প্রথম মাদ্রাসা মন্ত্রীর পদ তৈরি করে একে ঢালাও মদত দিল। এইসময় থেকেই শুরু হলো ব্যাপক বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ। দিনে দিনে বাড়ল অসহিষ্ণুতা। সংস্কৃতির রাজধানী বলে দাবি করা কলকাতার অমেরুদণ্ডী 'সেকুলার' বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চিন্তে মেনে নিলেন ইসলামি মোল্লাবাদীদের দাবি— ২০০৭-এ তসলিমা নাসরিন বিতাড়িত হলেন বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গ থেকে। কলকাতার কাছেই দেগঙ্গায় বামপন্থী শাসনে তিন দিন (৭-৯ সেপ্টেম্বর, ২০১০) ধরে চলল হিন্দুদের বাড়ি-মন্দির-দোকানের উপর আক্রমণ। মিলিটারি নামাতে হলো সরকারকে।

এরপর ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতা পাবার লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে থেকেই শুরু করেছিলেন সাম্প্রদায়িক তোষণনীতি। ক্ষমতা পাবার পর মুসলমান তোষণ শুরু হলো পূর্ণ শক্তি দিয়ে। শুরু হলো মাদ্রাসা শিক্ষার জোয়ার, ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভাতা। কামদুনি- কাটোয়ার মতো একের পর এক হিন্দু সমাজের মেয়েদের ধর্ষণে লিপ্ত হচ্ছে মুসলমান পুরুষেরা, বেআইনি মদ খেয়ে মৃতদের মুসলমান বলেই দেওয়া হচ্ছে সরকারি অনুদান।

বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের উপর আক্রমণ চলছে শাসকের মদতে। রাজনৈতিক মঞ্চে অধিষ্ঠান করছেন পীর-ইমামরা। বাংলাদেশের ইসলামি জঙ্গিরা ঘাঁটি গাড়ছে পশ্চিমবঙ্গে। দুর্গাপূজার দিনক্ষণ ঠিক হচ্ছে ইসলামি পরবের কথা মাথায় রেখে, কোথাও কোথাও দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা বন্ধ করা হচ্ছে। হিন্দু সমাজ আজ পশ্চিমবঙ্গে নির্ভয়ে বাঁচতে পারছে না।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের বিষয়টি আমাদের সামাজিক- রাজনৈতিক আলোচনায় না এলে শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গ আর থাকবে না। আগামী কয়েক দশকে তা হয়ে যাবে ইসলামি জেহাদিদের পদানত একটি রাজ্য— যে অবস্থা মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিছু অংশে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান। রাজধানী কলকাতাতে শুরু হয়েছে তার মহড়া।

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমাদের নতুন ভাবে ভাবতে হবে। আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গ ধর্মীয় কারণে বিভক্ত একটি বিশেষ রাজ্য। সেই জন্য সংবিধানের ৩৭১ ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। অসমের মতো সন্দেহভাজন ভোটারকে প্রকৃত অনুসন্ধান করে ডি-ভোটার করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিটি বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকে শনাক্ত করে বিতাড়নের কাজটি শুরু করতে হবে।

১৯৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে ধর্মীয় কারণে ভারতে চলে আসা হিন্দুদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায়কে 'সংখ্যালঘু' বলে গণ্য করা যাবে না। ধর্মীয় কারণে বিভক্ত পশ্চিমবঙ্গকে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করতে হবে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এটি একটি রাজনৈতিক কাজ। রাজনৈতিক দলকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে। ■

With best Compliments from :

CASTRON TECHNOLOGIES LIMITED

Manufacturer of :

FERRO MANGANESE

SILICO MANGANESE

LOW PHOS FERRO MANGANESE

Regd. office :

14, Bentinck Street, 1st floor, Room No. 8
Kolkata - 700 001, West Bengal (India)
Phone : (91-33) 22624465

Head Office :

Yogamaya, Dhaiya, Post - Nag Nagar
DHANBAD - 826 004, Jharkhand (India)
Phones : (91-326) 2207886, 2203390
Fax : (91-326) 2207455, E-mail : atul@castrontech.com

Works :

Phase- III/B-4, B-5, Bokaro Industrial Area
Balidih, Bokaro Steel City - 827 014
Jharkhand (India)
Phones : (91-6542) 253511, Fax : (91-6542) 253701

মহাউদ্ধারণ মঠ প্রতিষ্ঠার শততম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ধর্মসভা

আনন্দপুরুষোত্তম প্রেমাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর মহারাজের অনুগামী ও শিষ্য শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী ১৯২৫ সালে (৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) উত্তর কলকাতায় মানিকতলা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেন মহাউদ্ধারণ মঠ। মঠটির জমি ও সম্পত্তি দান করেছিলেন সুরতকুমারী দাসী। গত ১৩-১৫ জুন উদ্‌যাপিত হয় এই মঠের শততম বর্ষপূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব। উৎসবের প্রথম দিন, অর্থাৎ ১৩ জুন মানিকতলা-স্থিত রামমোহন লাইব্রেরি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় একটি মহতী ধর্মসভা। এই সভার সভাপতি ছিলেন মহানাম সম্প্রদায়ের সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য শাস্ত্রীর মঙ্গলাচরণের মধ্যে দিয়ে এদিন ধর্মসভার শুভ সূচনা হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ দান করেন মহানাম সম্প্রদায়ের সহ-সম্পাদক জ্যোতির্ময় গুহ। সভায় বক্তব্য রাখেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ, বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ, সুখচর কাঠিয়াবাবা আশ্রমের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ বৃন্দাবনবিহারী দাস কাঠিয়াবাবা, রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শ্রীমৎ কিঙ্কর সামানন্দ (ড. লোকনাথ চক্রবর্তী), নদীয়া জেলার আলাইপুর শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের শ্রীপাটের শ্রীমৎ রাধাবিনোদ ঠাকুর গোস্বামী, লেকটাউন গুরুধামের শ্রীমৎ দিলীপ গোস্বামী, নাগের বাজার নিবাসী কথক ও বিশিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাকার শ্রীমৎ পার্থসারথি গোস্বামী, মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ধামের সেবাধ্যক্ষ শ্রীমৎ নরহরি দাস ব্রহ্মচারী মহারাজ, বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের শ্রীমৎ গুরুবন্ধুদাস বাবাজী মহারাজ এবং হুগলী জেলার নালিকুলে কিঙ্করবাটী আদ্যা মন্দিরের সন্ন্যাসিনী দেবী সুমিত্রাম্বা (মিতা মা)। হরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর মহারাজের লীলামাহাত্ম্য, মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী, ভূতপূর্ব আচার্য ড. শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং সুরতকুমারী দাসীর অবদান, মহানাম সম্প্রদায় ও মহাউদ্ধারণ মঠের ইতিহাসও তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়গুলি বক্তারা তুলে ধরেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ বাসুদেব গোস্বামী, শ্রীমৎ বঙ্কুবিলাস ঠাকুর, শ্রীমৎ রাধাগোবিন্দ গোস্বামী, ডাঃ শ্রী নরোত্তম গুপ্ত, শ্রীমৎ বিবেকবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ শ্রীবাস গোস্বামী, শ্রীমৎ বন্ধুমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী, স্বামী সত্যপ্রকাশানন্দ গিরি, শ্রীমৎ আনন্দগোপাল দাস বাবাজী, শ্রীমৎ বিশ্বম্ভর দাস বাবাজী, শ্রীমৎ রসবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ জগত্তারণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী, শ্রীগোপাল ক্ষেত্রী, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী গোস্বামী, পরমাত্মা সাধিকা খনা মা প্রমুখ সাধুসন্ত-সহ ভারতাজির পত্রিকার সম্পাদক জয়নারায়ণ সেন, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক ড. উৎপল সাহা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, স্বস্তিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (সল্টলেক)-এর বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু প্রমুখ বিশিষ্টজন। এদিন সভায় বিশিষ্ট সাধুসন্ত-সহ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কুশলবরণ চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। গুণীজন সংবর্ধনা ও মঞ্চ সঞ্চালনা করেন শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ, শ্রীমৎ প্রভুশরণদাস ব্রহ্মচারী মহারাজ, শ্রীমৎ দ্বৈপায়নবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ ও শ্রী আশিস দাস। ধর্মসভায় বক্তাদের বক্তব্যের পর ভক্তিগীতি ও নামসংকীর্তন হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গৌরচন্দ্র কর্মকার, কীর্তন মোহান্ত, বন্ধুগোপী দাস, গীতা ভৌমিক ও গীতাঞ্জলি সাহা। গত ১৪ জুন মহাউদ্ধারণ মঠে অনুষ্ঠিত হয় উদয়াস্ত শ্রীশ্রীমহানাম মহাকীর্তন যজ্ঞ। এদিন মধ্যাহ্নে হয় শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরের ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। বিকালে হয় নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যারতি। গত ১৫ জুন সকালে শ্রীশ্রীপদাবলী কীর্তন করেন মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচগ্রামের শ্রী উৎপল চক্রবর্তী। মধ্যাহ্নে ভক্ত-বৈষ্ণবসেবার পর বিকালে অনুষ্ঠিত হয় পদাবলী কীর্তন। এরপর সন্ধ্যারতি অন্তে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। ■

ফ ঃ ৪

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের ত্রি-দিবসীয় অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী বৈঠক

গত ১৩-১৫ জুন হিমাচল প্রদেশের সিমলার শোঘিতে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের তিন দিনের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী বৈঠক। সভায় সংগঠনের আগামী কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে সংগঠনের অখিল ভারতীয় সংগঠনমন্ত্রী মহেন্দ্র কাপুর তাঁর ভাষণে আসন্ন কর্মসূচির রূপরেখা উপস্থাপন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল সদস্যকে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, আগামী ৫, ৬ ও ৭ অক্টোবর রাজস্থানের জয়পুরে সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য সকল আমন্ত্রিতদের সময়মতো তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে মূল বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, প্রাক্তন ডিআরডিও চেয়ারম্যান ড. জি সতীশ রেড্ডি বলেন, সম্প্রতি সম্পন্ন 'অপারেশন সিঁদুর' ভারতের একটি ঐতিহাসিক সাফল্য, যা প্রমাণ করেছে যে ভারত এখন দেশীয় প্রযুক্তির শক্তিতে উচ্চস্তরের প্রতিরক্ষা অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। এটি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা প্রেরণ করে যে ভারত আর পরনির্ভরশীল নয়। বর্তমান ভারত একটি আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল দেশ। অনুষ্ঠানের সমাপন অধিবেশনে অখিল ভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক নারায়ণ লাল গুপ্তা বলেন, ২০২৫ সালের ২৯ জুলাই, 'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০' বাস্তবায়নের ৫ বছর পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষ্যে, তিনি বিভিন্ন রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত সমীক্ষা পরিচালনা করার আহ্বান জানান, যাতে এর প্রধান বিষয়গুলি এবং সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি প্রকাশ্যে আসে এবং সেই ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনী উন্নতি করা যায়।

সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা শ্রীমতী গীতা ভট্ট। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১৮০ জন কার্যকর্তা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যালয় শিক্ষার প্রদেশ সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক, রাজ্য সহ-সভাপতি শর্মিষ্ঠা দে, রাজ্য অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক অসীম দাস ও শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উচ্চশিক্ষার বরিষ্ঠ সহ-সভাপতি পাপিয়া মিত্র ও অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক বিপুল সরকার-সহ মোট ৮ জন কার্যকর্তা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

ভারতসভা প্রেক্ষাগৃহে বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা

গত ১৪ জুন বঙ্গদেশ এবং বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের যৌথ উদ্যোগে মধ্য কলকাতা-স্থিত ভারতসভা হলে আয়োজিত হয় ৩টি বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ এবং একটি আলোচনাসভা। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবব্রত রচিত ‘একুশে-র মিথ জয় বাংলা-র মিথ্যা’, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস রচিত ‘বাংলাদেশ বাংলাদেশ’ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-নিবাসী সাংবাদিক শিতাংশু গুহ রচিত ‘ভারত ভাগ হয়েছে ধর্মের জন্যে ভাতের জন্যে নয়’— এই বই তিনটি এদিন প্রকাশ করেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের পূর্বতন রাজ্যপাল তথাগত রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের নির্দেশক ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ। বই তিনটির প্রকাশক হলো--- বইবন্ধু পাবলিকেশন। বিষয় উত্থাপন এবং অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন প্রবীর ভট্টাচার্য্য। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন তথাগত রায়, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ, ড. মোহিত রায়, ড. কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ড. জিষ্ণু বসু, রক্তিম দাশ ও দেবজিৎ সরকার। জেহাদিদের দ্বারা কলকাতা ও নোয়াখালীতে ভয়াবহ গণহত্যা এবং ১৯৪৭-পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হিন্দু নির্যাতনের বিষয়টি বক্তারা এদিন তুলে ধরেন।

অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজ এবং রাজস্থান পরিষদের উদ্যোগে মহারাণা প্রতাপজয়ন্তী উদ্‌যাপন

অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজ এবং রাজস্থান পরিষদের উদ্যোগে গত ২৯ মে কলকাতায় মহারাণা প্রতাপ জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান মহাসমারোহে পালিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কলকাতা শেক্সপিয়ার সরণীস্থিত মহারাণা প্রতাপ উদ্যানে মহারাণার প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করা হয়। সেখানে মহারাণা প্রতাপ সম্পর্কিত বীররসের কবিতা এবং শ্রীগীতার শ্লোক পাঠ করা হয়। তারপরে মূল অনুষ্ঠানস্থল মেট্রো স্টেশনের সামনে মহারাণার বড়ো মূর্তির পাদদেশে সকলে একত্রিত হন। সেখানে মাল্যার্পণের পর অনুষ্ঠান শুরু হয়। ক্ষত্রিয় সমাজের সংরক্ষক জয়প্রকাশ সিংহ এবং রাজস্থান পরিষদের মহামন্ত্রী অরুণপ্রকাশ মল্লাবত মহারাণা প্রতাপের ওপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। মহারাণা বিষয়ক কবিতা পাঠ করেন শ্রীমতী শশী লাহৌটি এবং বিশিষ্ট কবি হিমাদ্রি মিশ্রা। অনুষ্ঠানে প্রাতর্ভ্রমণকারীরাও অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অরুণপ্রকাশ মল্লাবত।

With Best Compliments from -

ARDA

অধিক দুধ উৎপাদন ও গবাদি পশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য সমস্ত দুধ উৎপাদকগণের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

- আলো বাতাসযুক্ত পরিষ্কার পরিবেশ শুকনো সমতল গোয়ালের ব্যবস্থা করুন।
- গবাদি পশুকে সুষম খাদ্য খাওয়াবেন, যার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ইত্যাদি উপযুক্ত মাত্রায় রয়েছে।
- একবার খাওয়ালে হজম করতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে, তাই দিনে দু'বারই খাবার দেবেন।
- গবাদি পশুকে খাওয়াবার এক থেকে দুই ঘণ্টা পর জল খাওয়াবেন।
- গবাদি পশুকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস খাওয়াবেন।
- মশা, মাছি, এটুলি থেকে গোয়ালঘরকে মুক্ত রাখতে পারলে গবাদি পশুকে অনেক ভয়ঙ্কর রোগ থেকে রক্ষা করা যাবে।
- অম্বল বা বদহজম থেকে আপনার গবাদি পশুকে রক্ষা করতে ভাত সেদ্ধ খাবার বা ভিজিয়ে খাবারের অভ্যাস ত্যাগ করুন।

রামময় বঙ্গভূমি

প্রায় সব জেলাতেই রামের নামে গ্রাম

নন্দলাল ভট্টাচার্য

অন্ধকে অন্ধ বলতে নেই। খঞ্জকে খঞ্জ। এ আপ্তবাক্য বহু দশকের। মান্যতা তাই দিতেই হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যখন বলতে হয় সত্য কথাটাই। অপ্রিয় হলেও আসলে আমাদের এই দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ছদ্ম-পণ্ডিতের আধিক্য দেখা দেওয়ার কারণেই এসব কথা বলার দরকার দেখা দিয়েছে।

এই ছদ্ম পণ্ডিতেরা হয় প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে অথবা শাসকের পদলেহনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত লাভের আশায় প্রায়শই এমনসব কথা বলেন যা বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত। অবশ্য কেবল শাসক নয়, অনেক সময় প্রগতির ধ্বজা উড়িয়ে নিজেদের জাহির করার লোভেও এসব কথা বলে থাকেন অনেকে। পাণ্ডিত্য অথবা বুদ্ধি বেচে আখের গোছানোর উদ্দেশ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার এক ইচ্ছাকৃত খেলায় মাতেন এঁরা। অনেকটা রাংতার মুকুট পরে রাজা সাজার মতোই।

এমনই কিছু মানুষ ভারতের অতীত-ঐতিহ্য অস্বীকার করে অথবা তার বিপরীতে কথা বলে প্রচারের ভেলায় ভাসতে চান। ওইভাবে ভাসার তাগিদেই তাঁদের কেউ কেউ 'বঙ্গদেশে রামের কোনো প্রভাব নেই', জাতীয় কথা বলে সত্যের অপলাপে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন না। ভাবের ঘরে চুরি করা এইসব ছদ্মজ্ঞানী কথাগুলি বলেন নিছক অজ্ঞতা অথবা ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণে।

'রামনাম সত্য হ্যায়' শুনলে এঁরা বলে ওঠেন, রাম! রাম! ওতো অবাঙ্গালি সংস্কৃতি। আর সেটা বলতে গিয়ে যে শব্দ তাঁরা উচ্চারণ করেন তার মধ্যে যে রয়েছে 'রাম' বেমালুম সেটা ভুলে যান।

বাংলাভাষা নিয়ে যাঁরা কিঞ্চিৎ চর্চা করেন, তাঁরা জানেন, বঙ্গের কেবল ধর্মীয় নয়, সামাজিক জীবনে 'রাম' শব্দটি জড়িয়ে রয়েছে অনেকটা জলে মিশে থাকা অক্সিজেনের মতোই। ইদানীং প্রযুক্তির উন্নতি, বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে। কিন্তু বহু শতক ধরেই বঙ্গজীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন রাম। কেবল অতীতে নয়, আজও রাম একইভাবে বিদ্যমান— একটু ভিন্নভাবে। আপাতত বর্তমান উড়িয়ে বরং একটু অতীতচারী হওয়া যাক।

বছর চল্লিশ আগে প্রায় সর্বত্র কাঁটা পাল্লায় যখন জিনিসপত্র মাপা হতো, সে সময় হিসেব রাখার জন্য বলা হতো 'রামে এক', 'রামে দুই' ইত্যাদি। অর্থাৎ রাম দিয়েই শুরু হতো গণনা। আজও গ্রামাঞ্চলে এমনটাই হয়ে থাকে।

এতো গেল সংখ্যা গণনার কথা। গ্রামবাঙ্গলায় একটু সম্পন্নদের বাড়িতে ধান মজুত রাখা হয় উঠোনে— এক আধারে— নাম যার গোলা বা মরাই। এই ধরনের জোড়া মরাইয়ের নাম 'রাম-লক্ষ্মণ'।

একই ভাবে বর্তমানে মিনিকিটের দাপটে পশ্চিমবঙ্গে দেশি চালের তো প্রায় বিলোপ ঘটেছে। কিন্তু জানেন কী, বঙ্গের সুগন্ধী সরু চালের নাম ছিল রামশাল বা রামশালি। ধান ছেড়ে আসা যাক ফসলে। বড়ো ঝিঙে বা ধুধুলকে বলা হয় 'রাম ঝিঙে'। 'রাম পটোল' হলো ঢেঁড়শ বা বড়ো পটোলের নাম। কলার নাম 'রামকলা' বা 'রামরম্ভা'। লবণ, তারও নাম 'রামলবণ'। মোটা বেশ বড়ো ধরনের রুটিকে বলা হয় 'রামরোট।'

একইভাবে বেশ লম্বা ঝুলওয়ালা ঢিলে জামা— নাম তার রামজামা। শিশুর হাতে খড়ি হবে। তার জন্য অপরিহার্য যে ফুলখড়ি বা চক তার নামও রামের নামেই 'রামখড়ি'। রামনাম জপ আর হরে রাম কীর্তন তো জীবনেরই একটি অঙ্গ তথা করণীয়। তিলক কাটার মাটি তারও নাম 'রামমাটি'। সবমিলিয়ে রামনাম জড়িত বাঙ্গালির নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। অবাক হলে 'হায় রাম', ভয় পেলেও 'রাম রাম', ঘৃণা বা ধিক্কার জানতেও ওই 'রাম রাম'। এককথায় রাম যেন বাঙ্গালির রোজকার জীবনের একটা অঙ্গ।

দিনের প্রথম প্রহরে গান শোনা— তার জন্য রয়েছে 'রামকরী' বা রামকেলি' রাগ। সঙ্গে বাজবে যে বীণা তার নাম 'রামবেণী'। সঙ্গতে বড়ো করতাল 'রামচাকি' 'রামগণ্ডী', 'রামচন্দ্র', 'রামশিঙা' ইত্যাদি আরও কত কী ?

'রামরাজ্য'-তো এখন প্রায় সোনার পাথরবাটি। কিন্তু অভাব নেই কুচক্রী-দুর্জন 'রামঘুঘু'দের। রামযাত্রা, রামদা, রামধনু বা রামধুন— ওসব তো স্রেফ কথায় লব্ধ। তাই বাদ থাক ওসব কথা। বঙ্গজীবনে রামের প্রভাব প্রমাণের দরকার নেই ওসব কথার উল্লেখ। 'রাম কহো ! এসব আবার প্রভাব নাকি— এও তো স্রেফ কথার কথা। আর রামনবমীর জায়গা বাঁধা কেবল পঞ্জিকাতে।' শ্রীরামনবমীও তো বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়েই রয়েছে।

তাই আসা যাক ভিন্ন কথায়। 'বঙ্গ'-এর প্রাচীনতম উল্লেখ ঐতরেয় আরণ্যকে। প্রাচীনতার দলিল এটা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই বঙ্গেরই অন্তর্গত এই পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলার ওপর এবার বরং নজর বোলানো যাক।

২০১১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার হিসেব— রামের নামে রয়েছে কম-বেশি ৪০ হাজার ২১৮টি গ্রাম। এইসব গ্রামের নামের তালিকা দেবে এক বিচিত্র তথ্য। ওইসব নামের মধ্যে রয়েছে কিছু ইতিহাস, কিছু লৌকিক বিশ্বাস, ব্যক্তিবিশেষের নাম বা কীর্তির কথা। কিন্তু বেশ বড়ো একটা অংশের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক ধরনের ধর্মীয় আবেগ। সেটা হিন্দু ও মুসলমান— দুইয়েরই। আর সেভাবে চিহ্নিত নাম শুনেই বোঝা যায় সেখানকার জমিদার অথবা সংখ্যাগুরুরা ছিলেন কোন ধর্মের। একইভাবে জমিদারির নানা হিসেব নিকেশেরও খোঁজ মিলবে এই নামাবলিতে, যেমন মিলবে বেশ কিছু ভৌগোলিক তথ্যও। নদীবহুল এই রাজ্যে, নদীর স্রোত ও গতিপথ বদলের ফলে সৃষ্টি হয় এবং বিলোপ ঘটে বহু জায়গার। তাই 'চর' যুক্ত গ্রামের নাম শুনেই বোঝা যায়। নদীর পলিতে তৈরি নবভূমি এইসব চরে গড়ে উঠেছে ওইসব গ্রাম।

গ্রামের নামের তালিকা নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে দেখা করে, এই রাজ্যে শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও রামের নামেই রয়েছে বেশির ভাগ গ্রামের নাম। পরিসংখ্যান বলছে, সর্বাধিক না হলেও ওইসব গ্রামের একটা বড়ো অংশের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে রামের নাম— বিভিন্ন ভাবে। রাম, রঘু, রাঘব ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে সীতার নাম যুক্ত গ্রাম যেমন রয়েছে, তেমন আছে রামজন্মভূমি অযোধ্যার নামও।

এক পর্যালোচনায়, রাজ্যের ২৩টি জেলার মধ্যে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি আর কালিম্পং জেলায় রামের নামে কোনো গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কলকাতা-সহ বাকি ২০টি জেলাতেই রয়েছে রামের নামে বেশকিছু গ্রাম। এরমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আছে সবচেয়ে বেশি রামের নামযুক্ত গ্রাম। সংখ্যাটা ১১৮-র বেশি। অন্যদিকে রাজ্যের রাজধানী তথা কলকাতা জোলাতেও রয়েছে রাম নামের অন্তত তিনটি অঞ্চল। যেমন বন্দর এলাকায় রামনগর, গড়িয়ার কাছে রামগড় এবং ডিহি শ্রীরামপুর। সব মিলিয়ে এই রাজ্যের কম করে ৯১০টি গ্রাম রামের নামে চিহ্নিত। প্রসঙ্গত, গোর্খা ও নেপালি গরিষ্ঠ দার্জিলিং জেলাতেও রয়েছে রামের নামে আট থেকে দশটি গ্রাম।

জনগণনার হিসেব অনুযায়ী, এই রাজ্যে রয়েছে ১২৬টি শহর। এর মধ্যে ছ'টি শহরের নাম রামের নামে। যেমন, গঙ্গারামপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর), রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), রামপুরাহাট (বীরভূম), রঘুনাথপুর (পুরুলিয়া), শ্রীরামপুর (হুগলি) এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের রামজীবনপুর। অর্থাৎ রাজ্যের শহরগুলির মধ্যে ৩.২৭ শতাংশের বেশি শহর রামের নামেই চিহ্নিত।

মোট গ্রামের তুলনায় রামনামের গ্রামের এই শতাংশ সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, মোট গ্রামের অর্ধেকেরও বেশির সঙ্গে কোনো দেব-দেবীর নাম যুক্ত নেই। আর যেগুলির সঙ্গে যুক্ত আছে, তার বড়ো অংশই ভাগাভাগি হয়েছে মূলত শিব-কৃষ্ণ- দুর্গার নামের গ্রামগুলির মধ্যে। সেক্ষেত্রে রাম নামের গ্রামের শতাংশকে তুচ্ছ করা যায় না কোনো মতেই।

যাইহোক, বিভিন্ন জেলায় রামের নামে চিহ্নিত বেশিরভাগ গ্রামের নাম রামচন্দ্রপুর, রঘুনাথপুর, রামনগর, শ্রীরামপুর, রাঘবপুর, রামেশ্বরপুর, রামপুর, রঘুদেবপুর, রামজীবনপুর, রামকৃষ্ণপুর, রামপ্রসাদপুর, রামগড়, গঙ্গারামপুর ইত্যাদি। রামকেলিও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার এক উল্লেখযোগ্য নাম।

লক্ষ্য করার বিষয়, রেলস্টেশন হিসেবে হুগলির শেওড়াফুলির নিকটবর্তী শ্রীরামপুরের নাম বহুজানিত হলেও এক হুগলি জেলাতেই রয়েছে শ্রীরামপুর নামে কম করেও পাঁচটি গ্রাম। একই ভাবে রাজ্যের বহু জেলাতেই শ্রীরামপুর নামের একাধিক গ্রাম রয়েছে। আবার রামচন্দ্রপুর নামেও প্রায় সব জেলাতেই আছে একাধিক গ্রাম। যেমন আছে রামনগর বা রামকৃষ্ণপুর বা রামেশ্বরপুর। পুরুলিয়া-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় রয়েছে অযোধ্যা, অযোধ্যা নগর ইত্যাদি নামের গ্রাম। আছে সীতারামপুর নামেও গ্রাম।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পূর্ববঙ্গ বাদ দিলে এই পশ্চিমবঙ্গও প্রায় রামময়। এবং সেটা বহু প্রচীনকাল থেকেই। তারপরও যদি কেউ বলেন বঙ্গজীবনে রামের কোনো প্রভাব নেই তাহলে স্মরণ করতে হবে শ্রীরামেরই নাম। বলতে হয়, হে রাম, তুমি এঁদের ক্ষমা করো। এরা নিজেরাই জানেন না এঁরা কত বড়ো পণ্ডিত! □

পত্রসাহিত্যে স্বামীজীর মহাসমাধি

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

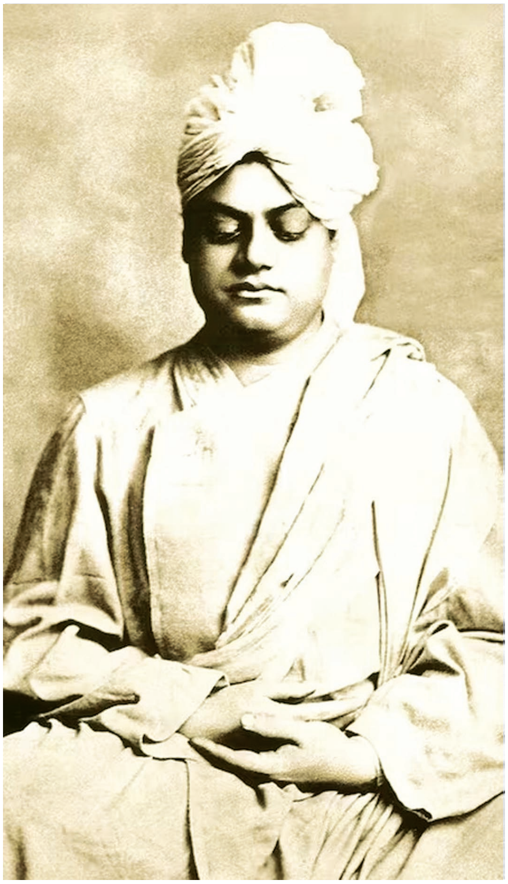

পত্রসাহিত্যে স্বামীজীর মহাসমাধির সংবাদ পাওয়া যায় স্বামী অভেদানন্দজীর সৌজন্যে। তখন তিনি আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের জন্য অবস্থান করছেন। স্বামীজীর প্রয়াণের সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছলে বিস্তারিত খবর জানার জন্য বেলুড় মঠে তিনি চিঠি লেখেন। সেই চিঠি বেলুড়ে পৌঁছানোর আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ তথা অভেদানন্দের গুরুভাই স্বামী সারদানন্দ বা শরৎ মহারাজ তাঁকে চিঠিতে বিস্তারিত লিখেছিলেন (৭ আগস্ট, ১৯০২)। ১৯০২ সালের ২০ আগস্ট বেলুড় মঠ থেকে স্বামী প্রেমানন্দও (বাবুরাম মহারাজ) স্বামী অভেদানন্দকে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন চিঠিতে।

শরৎ মহারাজের কথামতো, স্বামীজীর মৃত্যু খুবই অদ্ভুত। প্রায় মাস দুই আগে তিনি কাশীধামে গেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে ফেরেন। মঠে ফিরে তিনি কবিরাজি চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। একমাস ওষুধ ব্যবহার করার পর হাত-পা ফোলা আর রইল না, পেটে উদরীর জলও ছিল না। শরীরে লাবণ্য এসেছিল। এমনকী এক সপ্তাহের জন্য নদীয়ার জাগুলিয়াতে এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে গেছিলেন তিনি।

চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, এসময় স্বামীজীর বৈরাগ্যভাব বেড়ে যায়। রাত্রি চারটের সময় সকলকে নিয়ে ঠাকুরঘরে জপধ্যান করতেন আর বলতেন, ‘‘আমার কার্য্য হইয়া গিয়াছে, এখন তোরা সব কর্ দ্যাখ্, শোন্, আমায় ছুটি দে।’’ বলতেন, ‘‘আমার মৃত্যু শিয়রে, কাজকর্ম ও খেলা ঢের করা গিয়াছে, যা কাজ করিয়া দিয়াছি তাই এখন জগৎ নিক, তাই বুঝতে এখন ঢের দিন লাগবে।’’ মৃত্যুর দিন কয়েক আগে রাখাল মহারাজকে বললেন, ‘এবার যা হয় একটা এস্পার ওস্পার করিব, হয় শরীরটা ধ্যান জপ করিয়া সারিয়া কাজে ভালো করিয়া লাগিব, না হয় তো এ ভগ্ন শরীর ছাড়িয়া দিব।’’

কালী মহারাজকে (স্বামী অভেদানন্দ) লেখা শরৎ মহারাজের চিঠিতে জানা যায়, প্রয়াণের দিন স্বামীজী ঠাকুরের শয়নঘরে একলা বসে ধ্যান করেন। তারপর ঠাকুরের বিছানা নিজহাতে ঝেড়ে নীচে নেমে আসেন। সেদিন সকলের সঙ্গে বসে ইলিশ মাছের ঝোল, ভাজা ইত্যাদি দিয়ে ভাত খেলেন। খাবার পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম করে সকলকে ডেকে ব্যাকরণ ও যোগ সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা শিক্ষা দিলেন। যজুর্বেদের ‘সুষুম্নঃ সূর্য্য বর্চ্চসঃ’ পদের টীকা ঠিক নেই বলে সেই পদের ব্যাখ্যা নিজে করলেন। বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে মঠের বাইরে দুই মাইল বেড়িয়ে এলেন। পৃথিবীর সমস্ত জাতির সভ্যতা কীভাবে হলো সে ইতিহাস গল্পচ্ছলে তাঁকে বললেন স্বামীজী। ফিরে এসে বাহ্যে গেলেন এবং বললেন, দাস্ত খুব সাফ হয়েছে।

সন্ধ্যায় নিজের ঘরে এক ঘণ্টা মালা জপ করতে বসলেন। এরপর শয়ন করে ধ্যান করতে লাগলেন। একজন ব্রহ্মচারী কাছে বসে বাতাস করছিলেন। এক ঘণ্টা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার পর স্বামীজীর ডান হাতটি খানিকটা কাঁপতে লাগলো, বিন্দু বিন্দু ঘাম হতে লাগলো কপালে। মিনিট দুই পর মুখ দিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। মাথাটি নড়ে উঠলো, চোখ ভ্রূ'র মধ্যে স্থির হয়ে রইলো। মুখে একটা অপূর্ব জ্যোতি এবং হাসি দেখা গেল। মঠের সবাইকে ডাকা হলে তাঁরা দেখলেন হাত-পা ঠাণ্ডা, নাড়ি নেই। বরানগরবাসী ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ডাকা হলো। তিনি বললেন, স্বামীজী শরীর ত্যাগ করেছেন।

প্রয়াণের পর স্বামীজীকে কেমন দেখাচ্ছিল তা কালী মহারাজকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ), ‘কী সে জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল! কী সে তেজঃপূর্ণ বিস্ফারিত নেত্র। কেবল কৌপিন পরিহিত সে সুন্দর শরীরে এক অপূর্বকান্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল। তারপর দিবসেও সে মুখমণ্ডল দর্শন করে অনেকের দুঃখ শোক দূর হয়েছিল। ঠিক যেন শিব শুয়ে আছেন। কোনো অঙ্গের কোনোরূপ বিকৃতি হয় নাই। ইচ্ছা করে যেন শরীর ত্যাগ করিলেন।’ পরদিন বিকেলে স্বামীজীর শরীর অগ্নিসাৎ করা হয়। শরৎ মহারাজও চিঠিতে লিখছেন, ‘মুখের সে অপূর্ব ভাব শেষপর্যন্ত যে দেখিয়াছিল সেই মোহিত হইয়াছিল।’

(স্বামীজীর মহা সমাধি দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

Co-working offers more freedom, independence, possibilities for self-realisation.

At the Heart of Kolkata in Chandani Chowk

Address : 4th Floor, 10 Raja Cubodh Mullick Square

Don't be afraid to give up the good to go for the great.

FOR DETAILS CONTACT : 9836054628 I 8334051100

নজরুল-দরদি শ্যামাপ্রসাদ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

কাজী নজরুল ইসলাম যতদিন স্বমহিমায় সৃষ্টিশীল ছিলেন, ততদিন তাঁর বন্ধুবান্ধব অনুরাগীর কোনো অভাব ঘটেনি। অসামান্য দীপ্ত চেহারা, টানা টানা চোখ আর দরাজ গলায় তাঁর উপস্থিতির মধ্যেই এমন জাদু ছিল যে, ভক্ত-অনুরাগীর দল প্রায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। কবিতা পাঠের আসরে একের পর এক কবিতা পড়ছেন, ঘরোয়া সঙ্গীতের আসরে হারমোনিয়াম টেনে পরপর গেয়ে চলেছেন নিজের লেখা আর সুর করা গান, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন সম্মোহনী শক্তি সে যুগে অন্য কারও ছিল কিনা বলা শক্ত। কিন্তু এমন প্রাণমাতানো সৃষ্টিশীল মানুষকে এত মর্মান্তিক কিছু আঘাত পেতে হলো, যা হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনটাকেই নষ্ট করে দেয়।

নজরুলের বিরাট বন্ধুমহলের একাংশের অভিযোগ ছিল, তিনি একসময়ে হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছেন। কিন্তু পরিবার আর ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সে টাকা কেবল ফুঁকে উড়িয়ে দিয়েছেন। এই অভিযোগ কতদূর সত্যি, তা আর জানার উপায় নেই। কিন্তু ১৯৪২ সালে কবি যখন অজানা রোগে আক্রান্ত হলেন, বাস্তব আর অলীক জগতের মাঝে পেন্ডুলামের মতো দুলতে শুরু করল তাঁর চেতনা, তখন অভিযোগটা আরও ফুলে ফেঁপে উঠল। কেউ কেউ তো প্রকাশ্যেই বলতে লাগল তাঁর আজকের দারিদ্র্যের জন্য নজরুলই দায়ী। কী করে এঁরা বুঝবেন, বড়ো ছেলে বুলবুল যখন গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে চোখের সামনে চলে গেল, তখন রোগ নিরাময়ের জন্য আপ্রাণ খরচ করে গিয়েছিলেন বাবা নজরুল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করা যায়নি। চোখের মধ্যেও বসন্তের গুটি বার হয়েছিল বুলবুলের, বাবাকে কাছছাড়া করতে চাইত না এক মুহূর্ত। বয়স তখন তার মাত্র চার। এই অবস্থাতেই ১৯৩০ সালের মে মাসে মারা যায় বুলবুল। নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ লিখেছেন : 'উস্তাদ জমীরুদ্দিন খানের সঙ্গে নজরুলের যখন সঙ্গীত চর্চা চলত, তখন শুনে শুনেই সব শিখে ফেলত ছোট্ট বুলবুল। এমন দুরন্ত ছিল তার স্মৃতিশক্তি। আহা, অন্ধ হয়েও বুলবুল যদি বেঁচে থাকত! তাহলে একজন বড়ো গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ তো সে হতে পারত।'

দ্বিতীয় আঘাত স্ত্রী প্রমীলার নিরাময়ের অতীত অসুখ। যার জেরে বাকি জীবনটা তাঁকে শয্যাশায়ী হয়েই কাটাতে হয়েছে। চিকিৎসায় কোনো কার্পণ্য করেননি নজরুল। খরচ করেছেন হাজার হাজার টাকা। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল যে মাত্র চার হাজার টাকায় অসীমকৃষ্ণ দত্তর কাছে যথাসর্বস্ব বাঁধা দিতে হয়েছিল নজরুলকে। অবশেষে এল তৃতীয় ধাক্কা। বিচিত্র অসুখে আক্রান্ত হলেন কবি নিজেই। ১৯৪২ সাল। জুলাই মাস। হঠাৎ একদিন তিনি অনুভব করলেন জিব আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ডান হাতটা কাঁপছে। শরীর নির্জীব, নিস্তেজ। নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে যাওয়া স্ত্রীর শয্যাপাশে তিনি পড়ে রইলেন সারাদিন, যেন ওঠার শক্তিও নেই। নজরুলের অনুজপ্রতিম সুহৃদ জুলফিকার হায়দার প্রায়ই বাড়ি আসতেন। তিনি এসে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। রোগ দেখে তো মনে হচ্ছে প্যারালিসিস। তাহলে এখন উপায়?

আরও কয়েকদিন গেল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছিলেন প্রতিবেশী এক ডাক্তার। কিন্তু উন্নতির কোনও লক্ষণ নেই। প্রমীলাদেবীর মা গিরিবালা দেবীর সঙ্গে আলোচনা করে হায়দার সাহেব কবির অসুখের খবরটি সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজি, বাংলা প্রায় প্রত্যেকটি দৈনিকেই খবরটি গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হলো। তাঁরা ভেবেছিলেন, অসুখের খবর পেয়ে কাজী নজরুলের বন্ধু-অনুরাগী মহলে নিশ্চয়ই একটা সাড়া পড়ে যাবে, সবাই দেখতে আসবে। পাঁচজনে মিলে তখন ঠিক করা যাবে কোনপথে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা যায়।

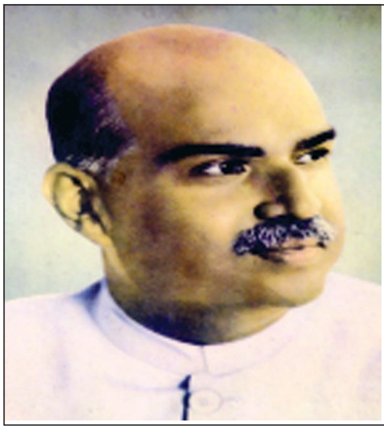

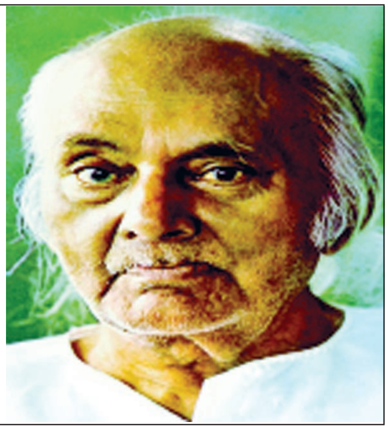

কিন্তু অপেক্ষাই সার। দিনের পর দিন কেটে গেল, কবির বন্ধুবান্ধবদের কাউকেই তাঁর বাড়ির ধারে-কাছে দেখা গেল না।'

জুলফিকার সাহেব লিখছেন : 'আমি যখন কাজীদার বাসায় গিয়ে পৌঁছই, তখন সকাল এগারোটা বেজে গেছে। ভাবী বললেন, জিবের আড়ষ্টতা আরও বেড়ে চলেছে। কী জানি কেন সকাল থেকেই তিনি খুব উত্তেজিত, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্রোধের সঙ্গে কী যেন বলছেন। হায়দার সাহেবকে দেখে নজরুল জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'তুমি এখনই ফজলুল হকের ভাগ্নে ইউসুফের ওখানে চলে যাও। তাকে তো তুমি চেনোই, ইউসুফকে নিয়ে তুমি হক সাহেবের কাছে যাও। গিয়ে বলো, 'নবযুগ' কাগজের খাটুনিতেই (নবযুগ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল) আজ আমি এই অসুখে পড়েছি। তিনি আমার সঙ্গে মোটেই ভালো ব্যবহার করেননি। যেমনটি আশা করেছিলাম সেরকম কিছুই পাইনি।'

বলতে বলতে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন নজরুল। সামনে খাবার দেওয়া হয়েছিল, টান মেরে ফেলে দিলেন। ঘরের সকলে চুপচাপ। যে যার জায়গায় বসে আছেন। এই অবস্থায় হায়দার উঠে এসে কবিকে বললেন, 'হক সাহেবের কাছে আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি দুটো খেয়ে নিন, নইলে যাব না।' মিনিট দশেক চিৎকার-চেঁচামেচি করে অবশেষে একটু যেন শান্ত মনে হলো কবিকে। ভাতের থালা আনা হলো। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও কেমন একটা অস্বাভাবিকতা। ঠিক উন্মাদের মতোই তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছেন। কখনও আবার বাঁ হাতে গ্রাস তুলে মুখে পুরছেন। মাসিমা গিরিবালা দেবী কাঁটা বেছে না দিলে মাছের কাঁটা বেছে খাওয়ার ক্ষমতাও তাঁর লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে সেদিন বিকেলেই জনাব ইউসুফ আলির বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন হায়দার সাহেব। সৌজন্য বিনিময়ের পর বললেন, 'ইউসুফ সাহেব, বন্ধু হিসাবে আপনার এবং আপনার স্ত্রী কবি মোতাহেরা বানুর কাছে কাজীদার দাবি, আপনি স্বয়ং ফজলুল হকের কাছে গিয়ে কবির আর্থিক দুরবস্থার কথা তাঁকে জানান, যাতে তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন।'

কবির অসুখের কথা শুনেও খানিকটা নির্বিকার ইউসুফ আলি। বললেন, হক সাহেব তো খুব ব্যস্ত থাকেন। গেলেই তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে— এমনটা হওয়া কঠিন। ছাড়লেন না হায়দার। বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'আমি কাল সকাল আটটার সময় হক সাহেবের কাছে যাচ্ছি এবং আপনাকেও সঙ্গে চাই।' অগত্যা রাজি হলেন ইউসুফ আলি।

৮৮/২, ঝাউতলা রোড। এই বাড়িতেই থাকতেন জনাব ফজলুল হক। ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত বঙ্গের 'চিফ মিনিস্টার'। এত সকালেও তাঁর বাসভবনের বৈঠকখানায় এমপি, এমএলএদের ঠাসাঠাসি ভিড়। হক সাহেব তখনও দরবারে বসেননি। যাঁরা এসেছেন তাদের মধ্যে গল্পগুজব চলছে। ইউসুফ সাহেবের সঙ্গে সোজাসুজি প্রাইভেট চেম্বারে ঢুকে গেলেন হায়দার। ফজলুল সাহেবকে পাওয়াও গেল। ইউসুফ আলি সংক্ষেপে কবির অসুস্থতার কথা তাঁকে জানিয়ে বললেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা এখনও কিছুই হয়নি। একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতে হয়।

হক সাহেব হায়দারের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কাল সকাল আটটার সময় আবার এসে আমাকে মনে করিয়ে দেবে। এখন আমি কিছুই বলতে পারছি না।

পরের দিন ১৯ জুলাই ১৯৪২। হক সাহেব যেমন বলেছিলেন সেই মতো নির্দিষ্ট সময়ে হাজির জুলফিকার হায়দার। কিন্তু গিয়েই তো চক্ষুস্থির। অন্তত পঞ্চাশ-ষাটজন এমএলএ চিফ মিনিস্টারকে ঘিরে বসে আছেন। জমে উঠেছে খাস দরবার। হক সাহেব অবশ্য একাই বক্তা। বাকিরা সবাই শ্রোতা। হায়দারকে দেখে ইশারায় বসতে বললেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সময় আর হয় না। অতি কষ্টে যখন চিফ মিনিস্টারের নাগাল পাওয়া গেল তখন ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। নিজের চেম্বারে ঢুকেই নুরুল হুদাকে নির্দেশ দিলেন, 'শিগগির শ্যামাপ্রসাদকে ফোনে কন্ট্রাক্ট করো।'

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তখন অবিভক্ত বঙ্গের অর্থমন্ত্রী।

---হ্যালো শ্যামাপ্রসাদ শোনো। কবি নজরুল ইসলাম অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। যতটুকু শুনলাম, মনে হচ্ছে প্যারালিসিস। ডাঃ বিধান রায়কে দেখাবার জন্য আমাকে এসে ধরেছে। তুমি একটু বিধান রায়কে দেখাবার ব্যবস্থা করে দাও।

মুখ্যমন্ত্রীর ফোন পেয়ে শ্যামাপ্রসাদ বিধান রায়ের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিতেই পারতেন। কিন্তু স্যার আশুতোষের এই মেজো ছেলেটি যে ধাতুতে গড়া, তাতে এক বিপন্ন কবিকে সামান্য উপকার করে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার মানুষ তিনি ছিলেন না। ফজলুল হক হায়দার সাহেবকে বলেছিলেন পরদিন লালদিঘির সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। হায়দার যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে শুনলেন, হক সাহেব জরুরি কাজে কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন। বিমূঢ় হায়দার শেষমেশ নজরুল ইসলামের কথা উল্লেখ করে একটা স্লিপ লিখলেন। কাগজটা আর্দালির হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখো তো, ডক্টর মুখার্জি যদি থাকেন, তবে ওটা তাঁর হাতে গিয়ে দাও।' আর্দালি স্লিপ নিয়ে ডক্টর মুখার্জির ঘরে ঢুকল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বলল, 'চলুন, সাহেব ডাকছেন।' নিজের ডেপুটি সেক্রেটারি মিস্টার ওয়াকারের সঙ্গে কথা বলছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। হায়দার ঢুকতেই তাঁকে বললেন, 'আধ ঘণ্টা পর ফের চলে আসুন।' টেবিলে আর একজন বসেছিলেন। চট্টগ্রামের এমএলএ ড. সানাউল্লা। শ্যামাপ্রসাদ তাকেও সবিনয়ে বিদায় করলেন। তারপর টেবিলে কনুই দিয়ে সামনে ঝুঁকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ এবার বলুন আপনি, কবির অবস্থা কি খুব খারাপ? কবে থেকে অসুখ? কী অসুখ?' হায়দারের কাছে কবির অসুস্থতার বিবরণ শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন শ্যামাপ্রসাদ। বললেন, 'আজ আশুতোষ কলেজে একটা ফাংশানে আমার উপস্থিত থাকার কথা। যাই হোক নজরুল সাহেব থাকেন কোথায়? আপনি কি তাঁর বাড়ি চেনেন?'

—'হ্যাঁ চিনি।'

—'তাহলে আমাকে নিয়ে চলুন। আমি তাঁকে দেখব।' তারপর আর্দালিকে বললেন, 'আমি আজ আর অফিসে ফিরব না। তুমি ওয়াকার সাহেবকে একথা বলে দিও।' এরপর নিজের গাড়িতে হায়দারকে নিয়ে উঠে পড়লেন শ্যামাপ্রসাদ। গাড়ি ছুটল গ্রে স্ট্রিটের দিকে। সেখান থেকে শ্যামবাজার।

—'আচ্ছা, কবির চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? ওঁর আর্থিক অবস্থা এখন কেমন?'

—'কী আর বলব। অবস্থা শোচনীয়। দেনায় একেবারে ডুবে রয়েছেন কাজী নজরুল।'

'ওঁদের তাহলে চলছে কী করে?'

শ্যামবাজারে পৌঁছে আর এক বিপত্তি। সংকীর্ণ সেকেলে বাড়ি, ততোধিক সংকীর্ণ সিঁড়ি। শ্যামাপ্রসাদ ওই খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন কী করে? গড়পড়তা বাঙালিদের তুলনায় তাঁর চেহারাটি যে কিঞ্চিৎ বড়োসড়ো! হায়দারের অস্বস্তি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। নিজে থেকেই বললেন, 'কী আর করা যাবে। দেখাই যাক না। আস্তে আস্তে উঠব'খন।' দোতলায় উঠে রীতিমতো হাঁফাতে লাগলেন খানিকক্ষণ। তারপর ঢুকলেন নজরুলের ঘরে। শ্যামাপ্রসাদকে দেখে হাত তুলে নমস্কার করলেন নজরুল। বলতে লাগলেন নিজের কথা, অসুখের কথা, এখন কী করতে চান সেই কথা। জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসছে, কথা ভালো বোঝা যায় না, তবু চেতনার জগৎ থেকে তখনও তিনি পুরোপুরি প্রস্থান করেননি। কাজী বলে যাচ্ছেন। সব কথা বুঝতে পারছেন না শ্যামাপ্রসাদ। তবু চেষ্টা করছেন প্রাণপণ--- সে এক স্মরণীয় আলাপচারিতা।

নজরুল বোধহয় অনুভব করছিলেন তাঁর কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদের। জড়ানো গলায় কাগজ-কলম চাইলেন। ছেলে সানি— কাজী সব্যসাচী— ছুটে গিয়ে পাশের ঘর থেকে কাগজ-কলম এনে দিল। কাঁপা হাতে লিখে চললেন কবি, তিনি মনে করছেন কমপ্লিট রেস্ট পেলে একেবারে সেরে উঠবেন। কলকাতায় সেই বিশ্রাম হবে না। অনবরত লোকজনের যাতায়াতে মাথা যাবে আরও গরম হয়ে। তিনি মধুপুরে যেতে চান প্রতিবেশী এক ডাক্তারের সঙ্গে।

কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন ডাঃ সরকার। নজরুলের সেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। শ্যামাপ্রসাদ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন চিকিৎসার গতিপ্রকৃতি। নজরুল কাগজে লিখেছেন, মুখেও বললেন, মাস দুয়েকের জন্য মধুপুর যেতে চান। স্ত্রীর নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে অসাড়। ট্রেনভাড়া, বাড়িভাড়া, খাইখরচ আর দেখাশোনার জন্য তাই আরও দুজন লোককে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য চাই কম করে এক হাজার টাকা।

সেই ১৯৪২ সালে এক হাজার টাকার অনেক দাম। পরাধীন ভারতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা তখনও এমন উন্নত হয়নি যে যখন তখন ব্যাংকে গেলেই টাকা তোলা যাবে। শ্যামাপ্রসাদ অবস্থাপন্ন মানুষ। ব্যাংকের সুবিধা তিনি পেতেই পারেন। কিন্তু নজরুলের বাড়িতে কথায় কথায় তখন পাঁচটা বেজে গেছে। ছুটি হয়ে গেছে ব্যাংক। এদিকে নজরুলের চিকিৎসার জন্য ডাঃ সরকারকে পরদিনই মধুপুর যেতে হবে। তাঁর সঙ্গে কবিকে সপরিবার পাঠিয়ে দেওয়াই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। চিন্তিত শ্যামাপ্রসাদ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে হায়দারকে বললেন, চলুন তো একবার ভবানীপুর। ওখানে আমার পরিচিত কয়েকটা জুয়েলারির দোকান আছে— চলুন তাদের কাছে যাই। মনে হয় খোলা পাব। একবার শ' পাঁচেক হাতে পেলে কাল টাকা শোধ করতে অসুবিধা হবে না।

শ্যামাপ্রসাদের গাড়ি ছুটল ভবানীপুরের পথে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কলকাতার রাজপথে জ্বলে উঠছে সারি সারি গ্যাসবাতি। আঁধার ঘনাচ্ছে দিগন্তে। ভিতরে নিশ্চুপ চিন্তামগ্ন শ্যামাপ্রসাদ আর হায়দার।

টাকা জোগাড় শেষপর্যন্ত হলো। মধুপুরে রওনা হলেন সপরিবার নজরুল। সারাদিন নজরুলের জন্য কেটে যাওয়ায় সেদিন আশুতোষ কলেজে আর যেতে পারেননি শ্যামাপ্রসাদ। ফাংশানটি ছিল বাবা, স্যার আশুতোষের স্মৃতি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। সারা দিনের ছুটোছুটির মধ্যে সে অনুষ্ঠানের কথা একবারও উচ্চারণ করেননি শ্যামাপ্রসাদ। বাবার স্মরণ অনুষ্ঠানে যেতেও পারেননি। বঙ্গের প্রিয় কবি সঙ্কটে পড়েছেন, সমস্ত জাতির হয়ে তার সুরাহা করতে তিনি ছুটে এলেন। কবির প্রিয়জনেরা বলছেন, নজরুলের সুসময়ে যারা বাড়ি এসে ভিড় জমাত, কাপের পর কাপ চা আর জলখাবারের সদ্‌গতি করত, তাদের কারোর খোঁজ নেই। এই অবস্থায় অভয়হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে এলেন এমন একজন মানুষ যাঁর সঙ্গে নজরুলের সেভাবে কোনও পরিচয়ই ছিল না।

১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে জুলফিকার হায়দারকে লেখা শ্যামাপ্রসাদের একটা চিঠি পাচ্ছি, তিনি লিখছেন : 'আপনি আমাকে যেদিন কবির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন কবির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে এসেছি। আপনার সঙ্গে আলোচনা করে উপায় উদ্‌ভাবনের জন্য উদ্‌গ্রীব রয়েছি। আপনি একদিন আমার এখানে এলে খুশি হব।'

আসলে এককালীন কিছু টাকা দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চাননি শ্যামাপ্রসাদ। সেটা খুব চেনা রাস্তা— সুনামও হয়, চাপও পড়ে না। তিনি চাইছিলেন একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে। কিন্তু একাজ একা একা করা যায় না। চাই লোকবল। চাই সমাজের প্রভাবশালী কিছু মানুষের সমর্থন। হায়দারকে যখন চিঠি লিখছেন শ্যামাপ্রসাদ, এই স্থায়ী ব্যবস্থার কথা তখনই তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরছিল।

উত্তর কলকাতায় শ্যামবাজারের কাছে মোহনবাগান রো-তে তখন ছিল শনিবারের চিঠির অফিস। নজরুলের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন হায়দার হাজির হলেন পত্রিকা সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের ঘরে।

---কী ব্যাপার হায়দার? বহুদিন পর। সবকিছু কুশল তো?

—না দাদা, ভালো আর কোথায়? কবি নজরুল ইসলাম জটিল অসুখে পড়েছেন। তাঁর বাড়ির লোক অর্থাভাবে বিপর্যস্ত।

নড়েচড়ে বসলেন সজনীকান্ত।

—তুমি আমাকে সব খুলে বলো হায়দার। কে দেখছেন? কী চিকিৎসা হচ্ছে? নজরুলের এখন কী রকম অবস্থা?

হায়দার সাহেব যতটা জানেন সবকিছু সবিস্তারে বলে চললেন। সজনীকান্তের ঘরে তখন উপস্থিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। খানিক বাদে হাজির হলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ। সকলে মন দিয়ে শুনলেন। ঠিক হলো পরদিন নজরুলের বাড়িতে সজনীকান্ত আর তারাশঙ্কর যাবেন। তারাশঙ্কর অবশ্য যেতে পারেননি সেদিন। তবে সজনীকান্তের সঙ্গে গিয়েছিলেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। নজরুল কাউকেই চিনতে পারলেন বলে মনে হলো না। একবার তাকিয়েই মুখ সরিয়ে নিলেন। নির্বাক, নিশ্চুপ। অন্য কোনও জগতের বাসিন্দা যেন। বেদনাহত অতিথিরা।

কিছু একটা করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন সজনীকান্ত। পরের রবিবার শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে মিটিং। হায়দারের সঙ্গে সেখানে হাজির হলেন তিনি। ভাইস চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদের বৈঠকখানায় তখন বসে আছেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং আরও জনাকয়েক বিশিষ্ট মানুষ। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, কবিকে রোগমুক্ত আর উদ্বেগমুক্ত করতে কিছু জিনিস আমি ভেবেছি। পরদিন আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব।

পরদিন বেলা ন'টা নাগাদ শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে আবার গেলেন দু'জনে। শ্যামাপ্রসাদ মনে মনে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমি ভেবে দেখলাম, প্রতি মাসে অন্তত শ' দুই টাকা কবিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার নিজের পক্ষে একা এই দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। তাই ভেবেছি এ মাসে পাইকপাড়ার মহারাজ বিমলাপ্রসাদ সিংহের কাছে কবি নজরুলের জন্য দুশো টাকা চাইব। পরের মাসে মেদিনীপুরের রাজা মল্লদেবের কাছে চেয়ে পাঠাব। এভাবে যে ক'দিন জোগাড় করতে পারি দিতে থাকি। পরে গভর্নমেন্টের থেকে একটা সাহিত্যিক ভাতা দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে। শ্যামাপ্রসাদ এইসঙ্গে একথাও স্পষ্ট করে দিলেন— এ বিষয়ে একটা কমিটি দরকার, যেখানে থাকবেন সমাজের বিশিষ্টরা।

সজনীকান্ত আর হায়দার মিলে তখনই একটা প্রাথমিক তালিকা তৈরি করলেন যাতে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর

CAPITAL TRANSPORT CORPN. OF INDIA

H.O.

25, Gangadhar Babu Lane, Kolkata - 700 012 Phone : 2215-4312, 2236-0713

Branches:

Aligarh l Mumbai * Delhi l Durgapur * Hyderabad l Chennai * Vezianagaram

BRITANNIA GLASS CO.

7, Swallow Lane, Kolkata - 700 001, (W. B.) India

Ph. - 0091-33-2210 4275 / 2230 5837 / 4064 5951

E-mail : gautam.ge@mail.com

britanniaglass@rediffmail.com

With Best Compliments from-

B.J.P. Ex-vice President

PIYUSH KANODIA

Kolkata North
Subarban District

With Best Compliments from -

A

Well wisher

বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, তুষারকান্তি ঘোষ, গোপাল হালদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। বিমলানন্দ তর্কতীর্থ খোদ রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসক ছিলেন ধন্বন্তরী আয়ুর্বেদাচার্য। কয়েকদিন আগেই তিনি বলেছিলেন, এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে কবি নজরুল মুক্তি পান, সেটাই তিনি একান্তভাবে চাইছেন।

দিন দুয়েক পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা বিল্ডিঙে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মিটিং। যথাসময়ে হাজির তারাশঙ্কর, সত্যেন মজুমদার, চপলাকান্ত, তুষারকান্তি, সজনীকান্ত, সকলে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সবার দিকে তাকিয়ে আবহাওয়াটা বোধহয় বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের একটা ত্রুটি হচ্ছে। কবি নজরুলের জন্য আমরা আজ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি তাদের মধ্যে একজন বাদে বাকি সবাই হিন্দু। আমার মনে হচ্ছে নজরুল সাহায্য কমিটিতে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের নাম থাকা অবশ্য প্রয়োজন, নয়তো কেউ না কেউ এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ খুঁজে পাবেন। খানিকটা বিতর্কের পর শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি সকলে মেনে নিলেন। শ্যামাপ্রসাদ এরপর মিটিঙের মধ্যেই কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমানকে টেলিফোন করে তাঁদের সম্মতি আদায় করলেন। শেষ পর্যন্ত যে কমিটি চূড়ান্ত হলো, তার সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ১৩।

১। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ। ২। সজনীকান্ত দাস, যুগ্ম সম্পাদক। ৩। জুলফিকার হায়দার, যুগ্ম সম্পাদক। ৪। সৈয়দ বদরুদ্দোজা, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ৫। স্যার এ এফ রহমান, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ৬। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য, কার্যকারী কমিটি। ৭। হুমায়ুন কবির, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ৮। বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ৯। তুষারকান্তি ঘোষ, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ১০। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ১১। চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ১২। গোপাল হালদার, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ১৩। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সদস্য কার্যকরী কমিটি।

কমিটি অর্থ সংগ্রহ করা শুরু করল সাধারণ মানুষের কাছে। তাদের জোগাড় করা মাসিক দুশো টাকায় এরপর কিছুদিন শান্তিতে ছিলেন নজরুল। মুদির দোকান, ঘরভাড়া সবটা মিটিত না। কিন্তু দুবেলা ভাতের ব্যবস্থা তো হচ্ছিল। এইভাবে চলল মাস পাঁচেক। তারপর ঘটল অভাবনীয় এক বিপর্যয়।

যষ্ঠ মাসের টাকা আসতে দেরি হচ্ছে কেন তার খোঁজ নিতে সজনীকান্তের কাছে গিয়েছিলেন হায়দার। প্রশ্ন শুনেই সজনীকান্ত অগ্নিশর্মা।

—'কী বলছ তুমি হায়দার? টাকা! কীসের টাকা? যে ক'মাস দেওয়া হয়েছে সেটাই দেওয়া উচিত হয়নি। ড. মুখার্জিকে বলে দিয়েছি তিনি যেন নজরুলের জন্য আর কারও কাছে হাত না পাতেন।'

—'কেন সজনীদা? কাজীদার কী অপরাধ?'

---'এই তো তোমাদেরই ধর্মের এক নামকরা কবি এসে বলে গেল, নজরুলের বাড়িতে এখনও আগের মতোই মণ্ডা-মিঠাই চলছে। আশ্রিতরা জাঁকিয়ে বসে রাজসিক খানাপিনা চালাচ্ছে। কারোর নড়বার নামটি নেই। এদিকে আমরা লোকের কাছে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছি!'

সজনীকান্তের রাগ যেন কিছুতেই যাচ্ছে না। বললেন, 'নজরুলকে সাহায্য করার ব্যাপারে আমার আর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। তুমি যদি মনে করো ড. মুখার্জিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো।'

কিন্তু কে সেই কবি? চেতনাহীন নজরুলের এতবড়ো সর্বনাশ যিনি করে এলেন! নাছোড়বান্দা জুলফিকার পীড়াপীড়ি করে শেষ পর্যন্ত সজনীকান্তের মুখ থেকে নামটা সেদিন জেনে নেন। রাগে ঘেন্নায় সর্বাঙ্গ রি-রি করে ওঠে তাঁর। কিন্তু কিছু করার নেই। ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুজফ্‌ফর আহমেদ— ওই কবির চেয়ে নজরুল আর তাঁর পরিবারকে অনেক ভালো চিনতেন সজনীকান্ত। তাহলে তিনি তখন কাজীর বাড়িতে গেলেন না কেন? কেন পরের মুখের ঝাল খেয়ে 'বুঝে' গেলেন, নজরুলের বাড়িতে মোচ্ছব চলছে। এমনকী শ্যামাপ্রসাদকেও প্রভাবিত করলেন।

আগের মতো সাদর সম্ভাষণ জুটল না। শ্যামাপ্রসাদের সেক্রেটারির কাছেও। অর্থাৎ রটনাটা তাঁর কানেও গেছে। হায়দারকে দেখে বসতেও বললেন না সেক্রেটারি চিত্তবাবু। পরে খানিকটা নরম হয়ে উগরে দিলেন সেই একই মুসলমান কবির নাম। যিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে দায়িত্ব নিয়ে এই 'উপকার' করে এসেছেন। কোনওমতে রাগ চেপে এরপর হায়দার ঢুকলেন শ্যামাপ্রসাদের ঘরে। ড. মুখার্জির মুখেও আগের সেই উষ্ণতা নেই। সৌজন্য বিনিময়ের পর নজরুলের মাসোহারার কথাটা পাড়তেই শ্যামাপ্রসাদ রাখঢাক না করে হায়দারকে বলে দিলেন, 'মাফ করবেন, আর টাকা দেওয়া যাবে না। ওই বাড়িতে যা চলছে, আগে জানতে পারলে এটুকুও আমি করতাম না।'

লজ্জায় দুঃখে শ্যামাপ্রসাদের বাড়ি থেকে সেদিন বেরিয়ে এসেছিলেন হায়দার সাহেব। চলে আসার আগে শুধু বলে আসেন, 'কারও মুখের কথা একতরফাভাবে বিশ্বাস করে নেওয়া বোধহয় ঠিক হলো না ড. মুখার্জি।'

শ্যামাপ্রসাদের চিন্তা সেদিন কিন্তু ওখানেই থেমে যায়নি। গোটা বিষয়টা অন্যভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন তিনি। তবে কি কোথাও ভুল হলো? নজরুলের বাড়িতে মোচ্ছব চলছে বলে যে কথা রটিয়ে গেলেন তাঁরই স্বজাতীয় কবি— সেটা কি ঠিক? নাকি গাত্রজ্বালা! রটনা করে অন্যের সর্বনাশের চেষ্টা? সাহায্য কমিটির তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেন না। কিছুদিন পর বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অসুস্থ, দুঃস্থ বিদ্রোহী কবির জন্য স্থায়ী সাহিত্যিক ভাতার ব্যবস্থা করে। এর পিছনে ছিল অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদেরই প্রশাসনিক তৎপরতা। ফজলুল হকের সঙ্গে আলোচনা করে মাসে দুশো টাকা করে সরকারি সাহায্য পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন শ্যামাপ্রসাদ রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে বিপর্যস্ত কবি পরিবারের একটু সাশ্রয়ের জন্য। এরপর ভারত যখন স্বাধীন হলো নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে করে দেয় তিনশো টাকা প্রতি মাসে।

যে মানুষটির সঙ্গে আগে কখনও পরিচয় হয়নি শ্যামাপ্রসাদের, যাঁর অসমান্য কাব্যপ্রতিভার তিনি স্বাদ পেয়েছিলেন দূর থেকে, বিপর্যয়ের সময়ে সেই নজরুলের পাশেই যেন জন্মজন্মান্তরের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যেন প্রমাণ করে গেলেন মুখে-মুখে ফেরা নজরুলের সেই কবিতাটি— 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু-মুসলমান।' ▯

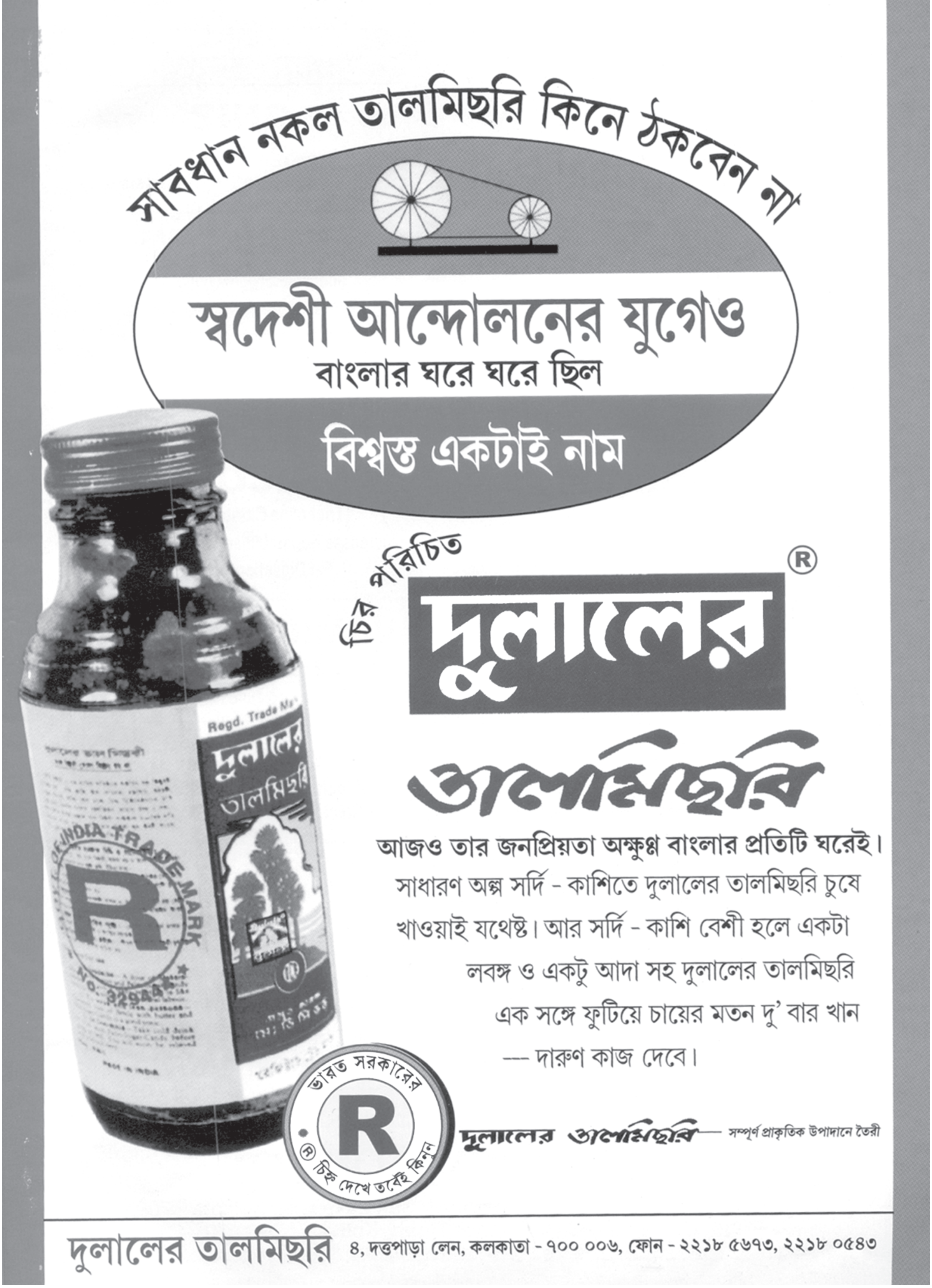
সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি 8, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ

অম্লান কুসুম ঘোষ

শ্যামাপ্রসাদ ক্ষণজন্মা পুরুষ। একদিকে তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য, পাশাপাশি ছিলেন সিংহহৃদয় রাজনীতিবিদ, তৎকালীন সময়ের দক্ষতম সাংসদ। তাঁর এতগুলি পরিচয়ের পাশাপাশি আরও একটি পরিচয় সম্ভবত অন্যান্য পরিচয়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়, সেই পরিচয় হলো তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিচয়। আর তাঁর জীবনের এই দিকটি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি বলেই দেশদ্রোহী কমিউনিস্টরা মিথ্যা কুৎসা রটনা করে যে শ্যামাপ্রসাদ স্বাধীনতা সংগ্রাম করেননি। ইতিহাস কিন্তু বলছে অন্য কথা।

বিগত শতকের কুড়ির দশকে শ্যামাপ্রসাদ তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আগমন আরও এক দশক পরে ১৯৩৭ সালে। স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী তখন প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয়েছে এবং ব্রিটিশ সরকারের বিভেদমূলক সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির ফলস্বরূপ মুসলমানদের জন্য তৎকালীন অখণ্ড বঙ্গের সিংহভাগ আসন বরাদ্দ হয়েছে এবং তার সুযোগে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলিম লিগের জোট সরকার। ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলোতে সেই নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার গঠিত হলেও বঙ্গপ্রদেশের নির্বাচনের ফল হয়েছিল ত্রিশঙ্কু। সাধারণ আসনগুলিতে কংগ্রেস জয়ী হলেও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে কংগ্রেস একটিও আসন পায়নি। সেই আসনগুলিতে জয়ী হয়েছিল মুসলিম লিগ এবং ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে সরকার গঠন করতে আগ্রহী থাকলেও নেহরু ও কংগ্রেসের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাদের আপত্তিতে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের জোট সম্ভব হয়নি। ফলে ফজলুল হক বাধ্য হয়ে জোট করেছিলেন মুসলিম লিগের সঙ্গে।

সেই মুসলিম লিগের জোট সরকার ব্রিটিশের সঙ্গে সহায়তায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নাস্তানাবুদ করতে শুরু করলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদের মূলত সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। সেদিক দিয়ে দেখলে বলা যায় যে তাঁর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কর্মটি ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ যা একরকমভাবে পরোক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রাম। এরপরে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা তো আরও মহান। ব্রিটিশের সহায়তাকারী মুসলিম লিগ জোট সরকারের থেকে ফজলুল হককে সরিয়ে এনে তাঁর সঙ্গে মিলিতভাবে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের অনেক এমএলএ-ই চাইছিলেন ফজলুল হকের সঙ্গে জোট করে সরকার গড়তে কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতাদের বাধায় পারছিলেন না। তাঁরাও ভরসা পেয়ে শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় সায় দেন এবং শ্যামা-হক মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সেই মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ফজলুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু আর অর্থমন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ স্বয়ং। এই মন্ত্রীসভা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পদে বিরোধিতা করে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতিটি অন্যায়কাজের প্রতিবাদ করে। এই মন্ত্রীসভা যখন গঠিত হয় তার দু'বছর আগেই অর্থাৎ ১৯৩৯ সালেই কংগ্রেস দেশের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে এবং সেই সমস্ত প্রদেশে শুরু হয়ে যায় মুসলিম লিগের সরকার। সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছিল সেই শাসনে। তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশ তার মধ্যে ব্যতিক্রমী শাসন উপহার দিয়েছিল এই শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার সৌজন্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মন্ত্রীসভা গঠনের ৯ মাসের মধ্যে শুরু হয়েছিল ভারত ছাড়ো আন্দোলন। কমিউনিস্টরা প্রচার করে যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রী ছিলেন এবং ব্রিটিশকে সহায়তা করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত তথ্য ভিন্ন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উপর তীব্র দমন শুরু করে ব্রিটিশ পুলিশ। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার আওতায় পুলিশ থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চলার জন্য যুদ্ধের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ আইন করে ব্রিটিশ সরকার সেই পুলিশকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল এবং সেই পুলিশকে দিয়ে চরম দমনপীড়ন চালিয়েছিল মেদিনীপুরের ভারত ছাড়ো আন্দোলনকারীদের ওপর। এই দমনপীড়নের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ এবং একটা তীব্র বিরোধিতা পূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন তৎকালীন ছোটোলাট জন হার্বার্টকে।

শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গের তৎকালীন গভর্নর জন হার্বার্টকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তার উল্লেখ— 'আমি সুভাষ বলছি গ্রন্থে' রয়েছে। চিঠিটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত এখানে প্রাসঙ্গিক হবে, ''জার্মানির অধিকৃত অঞ্চলে যেরূপ নৃশংস অত্যাচারের কথা আমরা শুনতে পাই, মেদিনীপুরেও তাই চলছে। সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশের সাহায্য শত শত বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। হিন্দুদের বাড়ি লুট করার জন্য মুসলমানদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেই এ কাজ করেছে। এমনকী ১৬ অক্টোবরের ঝড়ের পরেও গৃহলুণ্ঠন ও গৃহদাহের কাজ সমানভাবে চলেছে।... নিরস্ত্র ও অসহায় জাতির সঙ্গে লড়াই করা খুবই সোজা।

ভারতবাসী নিরস্ত্র, তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ পক্ষ থেকে বলা হয় যে ভারতবাসী নাকি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই যদি হয় তাহলে ভারতবাসীকে অস্ত্র সরবরাহ করা হোক। তারপর সমত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধ চলুক। অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিশ্চয় ভারতবাসী এই পরিবর্তনকে সাদরে সমর্থন জানাবে।'' (আমি সুভাষ বলছি : শৈলেশ দে, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭২২-৭২৩)। এই তীব্র জ্বালাময়ী চিঠিটি লেখার পরেই তিনি তীব্র ঘৃণার সঙ্গে পদত্যাগ পত্র ছুঁড়ে দেন ব্রিটিশ সরকারের মুখে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যখন শ্যামাপ্রসাদ ব্রিটিশের বিরোধিতা করে পদত্যাগ করছেন তখন কমিউনিস্টরা ব্রিটিশকে সমর্থন করে বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্য করছে এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করছে। উপরোক্ত দুটি ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী আর কমিউনিস্টরা ছিল দেশদ্রোহী, ব্রিটিশের স্তাবক। সেজন্যই আজও এসব বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্টরা শ্যামাপ্রসাদের নিন্দা করে এবং তাঁর নামে মিথ্যা কুৎসা রটায় কিন্তু তাতে শ্যামাপ্রসাদের মহিমা খাটো হয় না বরং তাঁর নাম কালস্রোতে ধৌত হয়ে নিত্য সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠছে। ▫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

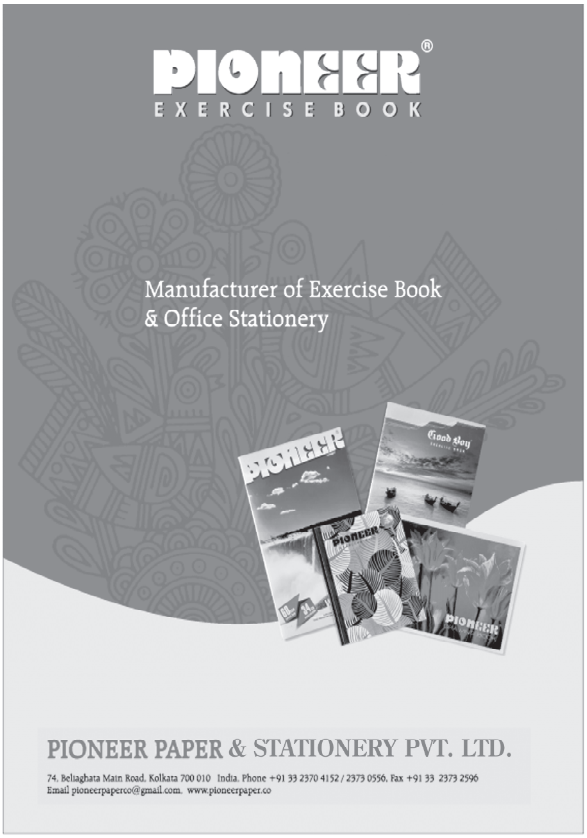

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ভারতীয় সংসদে জোট রাজনীতির প্রথম সফল প্রবক্তা

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ড. বিনয়ভূষণ দাশ

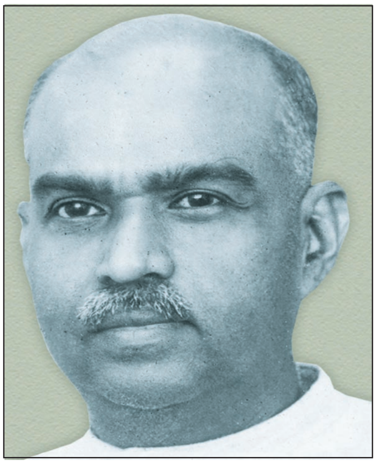

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর দিল্লির রাঘোমল আর্য উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সম্মেলনে দলের প্রথম সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বলরাজ ভাল্লা তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। তিনি ছাড়া দুই সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত ড. ভাই মহাবীর এবং পণ্ডিত মৌলীচন্দ্র শর্মা। যুবক অটলবিহারী বাজপেয়ীকে সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে নিযুক্ত করেন। এই অধিবেশনে ৫০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, অধ্যাপক বলরাজ মাধোক প্রমুখ নেতাকে যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, ইত্যাদি রাজ্যের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। নতুন এই দলের আদর্শ হিসেবে বলা হয়, নতুন দলটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও মর্যাদার উপর ভিত্তি করে ভারতকে পুনর্গঠিত করবে। দলের মূল আদর্শ হলো, 'এক দেশ এক জাতি, এক সংস্কৃতি এবং এক আইনের শাসন।' জনসঙ্ঘের দলীয় গঠন সম্পর্কে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দীনদয়াল উপাধ্যায় United Asia পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৬২ সংখ্যায় The Jana Sangh Perspective নামে এক প্রবন্ধে লেখেন, 'It (the party) was not a disgruntled, dissident, or discredited group of Congressmen who formed the nucleus of the party, as is the case with all other political parties; the latest in the field not excluded. Its inspiration came from those who basically differes from the Congress outlook and policies. It was an expression of the nascent nationalism.'

ভারতীয় জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টি বিষয়ক গবেষক মোতিলাল এ ঝাঙ্গিয়ানী তাঁর গবেষণা সন্দর্ভ Jana Sangh and Swatantra গ্রন্থে লিখেছেন, 'A new party, not of dissident or disillusioned Congressmen but of those who were diametrically opposed to Congress ideology and had a positive philosophy of their own which they later chose to call Bharatiya viewpoint.' এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার তাৎক্ষণিক কারণ হলো নেহরু সরকারের পাকিস্তানের দুই অংশের হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধদের প্রতি বিমাতৃসুলভ অবাস্তব পাকিস্তান নীতি। অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপনের কয়েকদিনের মধ্যেই, ২৫ অক্টোবর, ১৯৫১-তে দেশে প্রথম নির্বাচন শুরু হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ অবধি চলে। ফলে নতুন স্থাপিত এই দল নিজেকে গুছিয়ে নেবার আগেই তাকে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমে পড়তে হয়। দলের ম্যানিফেস্টো রচনা, প্রার্থী স্থির করা ইত্যাদি তাৎক্ষণিক বিষয় দলকে স্থির করতে হয় তাড়াহুড়ো করে। দলের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো রচনার ভার দেওয়া হয় Organiser পত্রিকার সম্পাদক কে আর মালকানির উপর।

এই নির্বাচন শুরু হয় ১৯৫১ সালের ২৫ অক্টোবর, দলের প্রতিষ্ঠার মাত্র চার দিনের মধ্যে। নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নিজের কংগ্রেস দলের নীতির বিষয়ে কিছু প্রচার না করে নতুন প্রতিষ্ঠিত জনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে 'সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিস্ট' অভিধায় দেগে দিয়ে এই দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেন। কারণ তিনি তখনই বুঝেছিলেন, ভবিষ্যতে এই দলটিই তাঁর দল কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে। দলের বিরুদ্ধে নেহরুর এই প্রচারের জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে দলের 'honorary publicity Secretary' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

১৯৫২-র নির্বাচনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, সেই নির্বাচনে কংগ্রেস এবং অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ ছাড়া অন্য কোনো সর্বভারতীয় দলের কোনো গুরুত্বপূর্ণ নেতা নির্বাচিত হতে পারেননি। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহরু এবং অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই নির্বাচনে জয়ী হন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই জয় সম্পর্কে জওহরলাল নেহরুর জীবনীকার মাইকেল ব্রেখার তাঁর Nehru : A Political Biography গ্রন্থে লিখেছেন, Only two leaders of all India parites were elected— Nehru and Dr. S.P. Mookerjee, the founder of the Jan Sangh. Many leading Socialists were rejected by the voters, as were Kripalani, Dr. P.C. Ghose and Ambedkar.

ফঃ ৬

LUXMI TEA CO. PRIVATE LIMITED

17, R. N. Mukherjee Road, Kishore Bhawan, Kolkata-700 001
Phone No. 2248 4437/4227, Fax No. 2243 0177
E-mail : pulakchow01@gmail.com   Web.: www.luxmigroup.in

GROUP GARDENS

NARAYANPUR T.E.	FULBARI T.E.
SHYAMGURI T.E.	URRUNABUND T.E.
MONMOHINIPUR T.E.	MAKAIBARI T.E.
MANOBAG T.E.	KENDUGURI T.E.
BHUYANKHAT T.E.	MORAN T.E.
MANU VALLEY T.E.	SEPON T.E.
GOLOKPUR T.E.	ATTABARIE T.E.
PEARACHERRA T.E.	LEPTKATTA T.E.
JAGANNATHPUR T.E.	ADDABARI T.E.
SAROJINI T.E.	DIRAI T.E.
	MAHAKALI T.E.

SHREE JAIN VIDYALAYA

Educational institution in Howrah, West Bengal

Address

25/1, Bonbehari Bose Road, Sandhya Bazar,
Choura Bustee, Shibpur, Howrah, West Bengal- 711101
Phone - 033-22426369

যদিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিহারের আঞ্চলিক দল ঝাড়খণ্ড পার্টির এস জয়পাল সিংহ সেই নির্বাচনে জয়ী হন। কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি (কেএমপিপি)-র সভাপতি আচার্য জেবি কৃপালানি (জীবতরাম ভগবানদাস কৃপালানি) এবং সোশ্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অশোক মেহতা পরে উপ-নির্বাচনে জয়ী হন। এই নির্বাচনে সদ্যগঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘ মোট ৯৩টি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়ে তিনটি আসনে জয়ী হয়। অন্যদিকে রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে মোট ৭২৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩৫টি আসনে জয়ী হয়। বিধানসভাগুলির মধ্যে রাজস্থান বিধানসভায় সর্বাধিক ১১টি আসনে জয়ী হয় এবং দ্বিতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট ৯টি বিধানসভা আসনে জয়ী হয়। মেদিনীপুর জেলা থেকে সর্বাধিক ৮টি আসন এবং অখণ্ড ২৪ পরগনা থেকে একটি আসনে জয়ী হয় দল। মেদিনীপুর জেলা থেকে সর্বাধিক আসনে জয়ের কারণ হলো, বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের সময় বিদেশি ইংরেজ শাসকের পুলিশ সত্যাগ্রহী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর ব্যাপক অত্যাচার চালায়। ইংরেজ পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রাজ্যের শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে দাঁড়ান। এই ঘটনা তাঁকে মেদিনীপুর জেলায় ভীষণ জনপ্রিয় করে তোলে। তারই ফলশ্রুতি এই নির্বাচনী ফলাফল।

ভারতীয় জনসঙ্ঘের লোকসভায় নির্বাচিত সদস্যরা হলেন দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতা কেন্দ্র থেকে জয়ী দলের সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি কমিউনিস্ট নেতা সাধন গুপ্তকে হারিয়ে নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দ্বিতীয় জয়ী প্রার্থী হলেন দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী অতুলচন্দ্র বসুকে হারিয়ে সংসদে নির্বাচিত হন। জনসঙ্ঘের তৃতীয় জয়ী প্রার্থী হলেন রাজস্থানের চিতোর থেকে নির্বাচিত উমাশঙ্কর মুলজীভাই ত্রিবেদী। তিনি রাজস্থানের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মাণিক্যলাল বার্মাকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য যে, নির্বাচিত এই তিন সদস্যই পেশায় ব্যারিস্টার ছিলেন। আর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একসময়ে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য।

এই প্রথম নির্বাচনে ভারতীয় জনসঙ্ঘের নির্বাচনী ফলাফল আহামরি কিছু ছিল না; যদিও একটি সদ্য স্থাপিত দলের পক্ষে হতাশাজনক নয়। দলের এই ফলাফল সম্পর্কে অন্যতম নেতা অধ্যাপক বলরাজ মাধোক লিখেছেন, Viewed in the light of the serious handicaps under which the Jana Sangh contested the elections, it was a remarkable achievement. রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক অধ্যাপক মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী) জনসঙ্ঘের এই জয়কে 'ভালো করেছো' বলে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, '(the party) should go ahead with calm confidence in themselves and their mission.' ওই বছরের জুন মাসে সংসদের অধিবেশন শুরু হলে এটা পরিষ্কার হয় যে, বিরোধীগোষ্ঠীতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ, সবচেয়ে দক্ষ এবং সবচেয়ে বাগ্মী সাংসদ।

প্রথম লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই ড. মুখোপাধ্যায় সংসদে একটা যৌথ সংসদীয় দল গঠনের জন্য কথাবার্তা শুরু করে দেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, সংসদে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে বাগে আনতে এবং সঠিক পথে চালনা করতে হলে বিরোধী দলগুলির একটা সুসংহত রূপ প্রদান করা বিশেষ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে ২৮ মার্চ, ১৯৫২ নয়াদিল্লিতে ড. মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে লোকসভার ৪৫ জন সাংসদ একটি বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে ভারতীয় জনসঙ্ঘ, অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা, গণতন্ত্র পরিষদ, আকালি দল, কমনওয়েলথ পার্টি, তামিলনাড়ু থেকেও দুটি দল এবং কয়েকজন নির্দল তামিল সদস্য যোগদান করেন। যদিও রামরাজ্য পরিষদ এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেনি। ড. মুখোপাধ্যায় এই গোষ্ঠীকে আরও বড়ো আকার দেওয়ার জন্য সোশ্যালিস্ট পার্টির অশোক মেহতা এবং সুচেতা কৃপালানির সঙ্গে কথাবার্তা চালান।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সংসদে বাম এবং কমিউনিস্ট দল একটি পৃথক গোষ্ঠী গঠনের জন্য নিজেদের মধ্যে আলাদাভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যায়। কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর লোকসভায় নেতা একে গোপালন সমাজতন্ত্রী এবং কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টিকে তাঁদের প্রস্তাবিত গোষ্ঠীতে যোগদানের জন্য কথাবার্তা চালান। কিন্তু এই দুটি দল কমিউনিস্টদের সঙ্গে কোনো গোষ্ঠীতে যোগদান করতে রাজি ছিল না আগেকার খারাপ অভিজ্ঞতার কারণে। বরং এই দল দুটি নিজেরা মিশে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। একসময়ে দল দুটি মিশে গিয়ে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠন করে। এইভাবে কমিউনিস্টদের একটা বামপন্থী 'ব্লক' গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওই বছরের জুন মাসে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৩২ জন সাংসদের একটি গোষ্ঠী গঠিত হয়। এই গোষ্ঠীতে রাজ্যসভার ৬ জন সাংসদও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যার মধ্যে পরবর্তীকালে দলের সভাপতি আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষও ছিলেন। এই গোষ্ঠী ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে পরিচিত হয়। এই গোষ্ঠী ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই গোষ্ঠীতে ড. মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এই গোষ্ঠীতে বাগ্মিতায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ ছিলেন না। যার ফলে তিনি মনে করলে এই গোষ্ঠীর জন্য প্রদত্ত সময় তিনি নিজের ইচ্ছে মতো কাজে লাগাতে পারতেন। এছাড়া এই গোষ্ঠীতে রাজ্যসভার ৬ জন সাংসদ ছিলেন। অর্থাৎ, সাকুল্যে ৩৮ জন সাংসদ ছিলেন এই ব্লকে। অবশ্য এই গোষ্ঠীতে ভিজি দেশপাণ্ডে, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি রামচন্দ্র রেড্ডি, হুকুম সিংহ, উমাশঙ্কর ত্রিবেদীর মতো অভিজ্ঞ সাংসদও ছিলেন।

সংসদে বামপন্থী বাদে অন্য দলগুলির সংসদীয় জোট হলেও রাজ্যস্তরে এই জোট দানা বেঁধে ওঠেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল রাজস্থান। সেখানে কংগ্রেস দল অল্পের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সমর্থ হয়। ওই রাজ্যে কংগ্রেস ৮১টি আসন এবং বিরোধীরা ৭৭টি আসনে জয়ী হয়। সেখানে টিকারাম পালিওয়ালের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। বিকানেরের রাজা কুঁয়র যশবন্ত সিংহের নেতৃত্বে

With Best Compliments from

P. C. CHANDRA® JEWELLERS

A jewel of jewels

pcchandraindia.com | amazon | GET IT ON Google Play Download Now

Follow us on /pcchandrajewellersindia

+918010700400 (Except Sunday)

OUR SHOWROOMS

Bowbazar | Gariahat | Chowringhee | Ultadanga | Golpark | Barasat | Behala | Arambagh
Balurghat | Bankura | Cooch Behar | Katwa | Krishnanagar | Malda | Purulia | Siliguri
Siuri | Tamluk | Agartala

ALL THE BELOW MENTIONED SHOWROOMS WILL REMAIN OPEN ON SUNDAYS

Hatibagan | New Town | Howrah | Serampore | Chandannagar | Sodepur | Habra | Kanchrapara
Baruipur | Barrackpore | Asansol Berhampore | Burdwan | Durgapur | Midnapore | Raiganj | Delhi
Bengaluru (Ulsoor & Koramangala) | Bhubaneswar | Jamshedpur | Noida | Mumbai | Ranchi

সংযুক্ত দল গঠিত হয়। এই জোটে কংগ্রেস বিরোধী প্রায় সব দলই যোগ দিয়েছিল।

এই জাতীয় গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে ড. মুখোপাধ্যায় ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর সংসদীয় দক্ষতা সম্পর্কে বিখ্যাত সাংবাদিক দুর্গাদাসের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দুর্গাদাস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ India : from Curzon to Nehru and After গ্রন্থে ড. শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ''There were only three effective spoke for the largest group which opposed Nehru's policies. In oratory and debating skill, he excelled all others who have followed him. Mookerjee used to tell me that the only way to create an alternative to the Congress was to demolish Nehru's image. He died while in detention in Srinagar in 1953 and a promising political career was thus cut short.''

জনসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভার বিধায়কেরা যৌথভাবে জনসঙ্ঘের আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত করেন। একইভাবে মধ্যভারত থেকে হিন্দু মহাসভার নেতা সিএস রাও এবং মাদ্রাস থেকে টয়লার্স পার্টির টিভি কমলাস্বামী রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন।

ছোটো এই দলগুলির জোটে শ্যামাপ্রসাদের মতো কোনো বক্তা বা অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই বাগ্মী শ্যামাপ্রসাদ এই জোটের নেতা নির্বাচিত হন। জোটে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং তিনি চাইলেই জোটের জন্য বরাদ্দ পুরো সময়টাই নিজে ব্যবহার করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করতেন না। অন্যদেরও সুযোগ দিতেন। কিন্তু নেহরুর সঙ্গে পাল্লা দেবার প্রয়োজন বোধ করলে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা করতেন আর অন্যরাও এতে আপত্তি করতেন না। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'শ্যামাপ্রসাদ ও সুচেতা কৃপালনী বলতে চাইলে স্পিকারের অনুমতি পেতে তাঁদের কোনো অসুবিধা হতো না। তাঁরাও তাঁদের সদস্যদের বঞ্চিত করে বক্তৃতা দিতে চাইতেন না।' এই ধরনের মহানুভবতা আজকের দিনে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই প্রথম সফল 'কোয়ালিশন' বা জোটের রূপকার। ভারতীয় জনসঙ্ঘের পরিবর্তিত রূপ ভারতীয় জনতা পার্টিও তাঁর আদর্শকে রূপায়িত করে পরবর্তীকালেও জোট সরকার সফলভাবে চালিয়ে আসছে। ভারতীয় জনসঙ্ঘ তথা পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির জোট সরকার সফল ভাবে চালিয়েছেন তাঁরই রাজনৈতিক শিষ্য তথা ব্যক্তিগত সচিব অটলবিহারী বাজপেয়ী।

পরবর্তীকালে নরেন্দ্র মোদীও তাঁদেরই অনুসরণে কয়েকটি দলের সম্মিলিত জোট সরকারের সফল নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। এরই পাশাপাশি আমরা যদি এইচডি দেবেগৌড়া, চন্দ্রশেখর, আইকে গুজরাল, ভিপি সিংহ, মনমোহন সিংহ প্রমুখ নেতাদের জোট সরকারের দিকে তাকাই তাহলে তাঁদের জোট সরকারের নেতৃত্বদানে ব্যর্থতার দিকটিই সামনে আসে। রাজ্যস্তরেও বিহার, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ইত্যাদি রাজ্যে বিজেপি সর্বাধিক আসন পেলেও জোটরাজনীতির স্বার্থে অন্য দল যথা জেডিইউ, শিবসেনা, অকালি ইত্যাদি দলকে মুখ্যমন্ত্রিত্বের আসন ছেড়ে দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় রাজনীতিতে জোটের নেতৃত্বদানে সবচেয়ে সফল হলো জনসঙ্ঘ তথা ভারতীয় জনতা পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই অন্যান্য অনেককিছুর মতোই জোট রাজনীতির সফল রূপায়ণের কলাটিও শিখে নিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংসদের প্রথম দুটি বছর ছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ ও জওহরলাল নেহরুর দ্বৈরথের যুগ। যদিও সেই সময়ে সংসদ সদস্য হিসেবে ছিলেন আচার্য জীবতরাম ভগবানদাস কৃপালানী, ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর, সি রাজাগোপালাচারী, এইচ ভি কামাথ, হৃদয়নাথ কুঞ্জুরু, ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনির মতো দিগ্‌গজ সব সাংসদেরা। কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দুর্দান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত তাৎক্ষণিক উত্তরদানের ক্ষমতায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ফলে কথার লড়াই হতো জওহরলাল নেহরু এবং সংসদের অলিখিত নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে। নেহরুর জীবনীকার ওয়াল্টার ক্রোকারের মতে, সংসদে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সক্রিয় সাংসদ। সংসদীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তথ্যপ্রদানের ক্ষমতা ও দক্ষতায় তিনি জওহরলাল নেহরুকে ছাড়িয়ে যেতেন।

বিরোধী পক্ষের একেবারে সামনের সারিতে, ট্রেজারি বেঞ্চের মুখোমুখি তাঁর আসন নির্দিষ্ট ছিল। গমগমে গলায় তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালে মনে হতো, তিনিই যেন সভার কেন্দ্রবিন্দু। শ্যামাপ্রসাদ সংসদে দেশের সব সমস্যা ও বিষয় নিয়েই কথা বলতেন। তবে নেহরু সরকারের অনুসৃত ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক, ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতি এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু-বৌদ্ধ ও শিখ উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বাসন নিয়ে বক্তৃতায় তাঁর জুড়ি কেউ ছিলেন না। এমনকী কংগ্রেসের এক বিরাট অংশ নেহরুর পাকিস্তান নীতিতে আস্থাবান ছিলেন না; কিন্তু তাঁরা নেহরুর ভয়ে চুপ করে থাকতেন। তাঁদের অনেকেই ড. শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতায় নিজেদের মনের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেতেন।

সাংবাদিক শঙ্কর ঘোষ তাঁর 'হস্তান্তর' গ্রন্থে তাঁদের সম্পর্কে লিখেছেন, 'শ্যামাপ্রসাদ বক্তৃতা দিতে উঠলে তাঁরা সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলের চা, কফির আড্ডা ফেলে লোকসভা কক্ষে উপস্থিত হতেন এবং নেহরুর বক্তৃতা যতটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন ঠিক ততটা মনোযোগ দিয়েই শুনতেন শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য। শ্যামাপ্রসাদের বলায় একটা জাদু ছিল এবং সভাকক্ষে তা এমনই একটি মোহ বিস্তার করত যে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে কেউই সেই মোহজাল ভাঙার কথা ভাবতেই পারতেন না। 'অবশ্য হিংসুটে জওহরলাল নেহরু চাইতেন না, কংগ্রেস দলের সদস্যরা এত মন দিয়ে শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য শুনুক। সুতরাং, নেহরু মাঝে মাঝেই শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য পেশের সময় উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিতেন এবং তখন যে কথা কাটাকাটি হতো তাতে নেহরুরই পরাজয় ঘটত। 'সংসদীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দক্ষতায় শ্যামাপ্রসাদ নেহরুকে ছাড়িয়ে যেতেন।'

এই পত্রিকাতেই আগের একটি প্রবন্ধে আমি সংসদে শ্যামাপ্রসাদ

ও নেহরুর দ্বৈরথ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছি। তাই সে সম্পর্কে বিস্তারিত এখানে আর উল্লেখ করছি না। কংগ্রেস বিরোধী সব দলকে একটি জোটে নিয়ে আসতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সবসময়ই জাতীয় স্তরের রাজনীতি নিয়েই বেশি আগ্রহী ছিলেন। রামগড়ের রাজা কামাক্ষা নারায়ণ সিংহ এবং তাঁর জনতা পার্টিকে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটে নিয়ে আসার জন্য শ্যামাপ্রসাদ চেষ্টা শুরু করেন। কংগ্রেস দল মনে করত, জনতা পার্টি জনসঙ্ঘের সঙ্গে জোট করতে ইচ্ছুক। ওই বছরের, অর্থাৎ এপ্রিল ১৯৫২ মাসে ড. মুখোপাধ্যায় ওড়িশার গণতন্ত্র পরিষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ওই রাজ্যে যান। তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে গণতন্ত্র পরিষদ জনসঙ্ঘে মিশে যায়। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মুম্বাই (তখন বোম্বাই) যান সমাজতন্ত্রী দলের অশোক মেহতার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে 'জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক' জোটে যোগদানে রাজি করাতে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন, কংগ্রেস বেশিদিন ক্ষমতায় থাকলে ভবিষ্যতে দেশের সমূহ সর্বনাশ। তাই তিনি দেশের প্রথম নির্বাচনের সময় থেকেই কমিউনিস্ট বাদে অন্য কংগ্রেস বিরোধী দলগুলিকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসা খুব প্রয়োজন বলে মনে করতেন। তাই তিনি প্রথম লোকসভা নির্বাচনের পরে পরেই সংসদে দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক দলগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি সক্রিয় জোট গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কমিউনিস্টপন্থী দলগুলি এই কাজে সফল না হলেও তিনি এই কাজে সফল হয়েছিলেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এই জোট সংসদে যথেষ্ট সক্রিয়তার সঙ্গে কাজ করেছে। এমনকী তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে। জাতীয় গণতান্ত্রিক দলও (National Democratic Party) স্বল্পায়ু হয়ে পড়ে।

শ্যামাপ্রসাদের এই অকালমৃত্যু বিরোধী রাজনীতি, বিশেষ করে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর ফলে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরু একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠেন। প্রলম্বিত হয় কংগ্রেস দলের শাসন। কংগ্রেসের শাসন অবসানের জন্য ভারতের নাগরিকদের অপেক্ষা করতে হয় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৭৭ সালে মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার ফলে কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনের অবসান হয়। এখানে স্মর্তব্য যে, জনতা পার্টিতে ভারতীয় জনসঙ্ঘ ছিল সর্ববৃহৎ গোষ্ঠী। □

শোকসংবাদ

মধ্যবঙ্গ প্রান্তের প্রবীণ প্রচারক স্বপন ঘোষের মাতৃদেবী ননীবালা দেবী গত ১৯ জুন মুর্শিদাবাদের কল্যাণপুর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। এক পুত্র, দুই কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর জেলার স্বয়ংসেবক বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সেবা ভারতীর কার্যকর্তা সুবীর দাসের মা শ্রীমত্যা কাঞ্চন দাস গত ১৪ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

With Best Compliments from-

THE JOREHAUT GROUP LIMITED · JOREHAUT · 1859

THE JOREHAUT GROUP LIMITED

Gardens :

Borsapori, Numalighur, Langharjan & Rungagora 'J'

THE JOREHAUT AGRO LIMITED

Bhadra Tea Factory

AGRI IMPORT & EXPORT LIMITED

Office : 26, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017, India

Phone : 2287-9388, 2290-4427, Fax : (033) 2281-0199

E-mail : jorehaut@jorehaut.com, Website : www.jorehaut.com

Producers & Exporters of Quality Teas Worldwide

With Best Compliments from -

A
WELL WISHER

(A.H)

LAUREL

FINANCIAL SOLUTIONS

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

(Stock Broker and Portfolio Manager Service)

LAURELMF FINMART PRIVATE LIMITED

(Member of Association of Mutual Funds in India)

MUTUAL FUND DISTRIBUTOR

JAIN BAID & CO.

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001

Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street
4th Foor
Kolkata - 700 069
Phone : Nos. 22483203
Fax No. 22483195
Email : eita.cal@eitain.com

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001
Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in
Fax : 91-33-22202260
GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas
Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)